Contents

৫ম বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০০২

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৫ম বর্ষঃ	৪র্থ সংখ্যা
শাওয়াল ও যিলক্বদ	১৪২২ হিঃ
পৌষ ও মাঘ	১৪০৮ বাং
জানুয়ারী	২০০২ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান মোল্লা

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক **আত-তাহরীক**
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮,
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১,
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধঃ**
  - আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলিম নির্যাতন (১৯৪২-৭৮) ৩
    - *মুহাম্মাদ মাহফুযুর রহমান*
  - হাদীছ সংকলনে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর অবদান ১০
    - *আবু তাহের*
  - হাদীছ কি ও কেন? ১৪
    - *মুহাম্মাদ হারূন আযীযী নদভী*
  - অতীন্দ্রিয় যে জগত অপেক্ষা করছে ১৮
    - *মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক*
  - আল্লাহ্‌র আনুগত্য ২১
    - *এডভোকেট গিয়াছুদ্দীন আহমাদ*
  - মৃত্যুঃ এর জন্যে আমরা কি প্রস্তুত? ২৩
    - *মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান*
- **মনীষী চরিতঃ** ২৫
  - ইমাম বুখারী (রহঃ)
    - *ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী*
- **নবীনদের পাতাঃ** ২৯
  - মায়ের দুধ ও অন্যান্য দুধঃ কুরআন, সুন্নাহ ও আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে
    - *ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর*
- **চিকিৎসা জগৎঃ** ৩২
  - ডেঙ্গুজ্বরঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও প্রতিকার
    - *ডাঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ভুঁইয়া*
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ** ৩৩
  - (ক) আভিজাত্যের পরিণাম (খ) পান্থশালা
    - *মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
- **কবিতা** ৩৪
- **সোনামণিদের পাতা** ৩৫
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৮
- **মুসলিম জাহান** ৪২
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৪
- **পাঠকের মতামত** ৪৬
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

c®Q` cwiwPwZ : Zv I nx` UÖ Gi ¤ªm¨R¥bÀ wbwgZ gÔj c|i Avn¥j nv`xm R\¥g gmwR`, evMgvi v, ivRkvnx|

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ!

সম্প্রতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীর লেখায় এবং রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িকতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার শোনা যাচ্ছে। এর দ্বারা তারা ইসলাম মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার পরোক্ষ ইঙ্গিত দিতে চান। তাঁদের বক্তৃতা ও লেখনী দৃষ্টে একথা খোলামেলা হয়ে গেছে যে, যেহেতু ইসলামী নৈতিকতা মানুষকে যথেচ্ছাচারে বাধা দেয়, সেহেতু ইসলামকে ব্যক্তি জীবন ও বৈষয়িক জীবন থেকে বিদায় করতে পারলেই যা ইচ্ছে তাই করার অবাধ লাইসেন্স পাওয়া যায়। কিন্তু কে না জানে যে, নিয়ন্ত্রণহীন মোটরগাড়ী খাদে পড়ে এক্সিডেন্ট করতে বাধ্য। অনুরূপভাবে নিয়ন্ত্রণহীন জীবন নিশ্চিত ধ্বংস ও অশান্তির কারণ হ'তে বাধ্য। অবশ্য এখানে গিয়ে তারা মানবিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখার কথা বলেছেন। যদিও মানবিক মূল্যবোধ বলতে কি বুঝায়, তার যথার্থ মানদণ্ড কি এবং এই মূল্যবোধ টিকিয়ে রাখার জন্য চিরন্তন নীতিমালা কি- এসবের কোন নিশ্চিত জবাব তাদের কাছে নেই। সেজন্যই দেখা যায় এইসব তথাকথিত অতি উদার ও অসাম্প্রদায়িক লোকেরা স্ব স্ব চিন্তা মতে কিংবা অপরের অনুকরণে নানাবিধ কর্মকাণ্ড করে থাকেন। যার প্রায় সবটুকুই বিলাস কল্পনার ফসল, স্রেফ অপচয় এবং স্বভাব ধর্ম ইসলামের সাথে সংঘর্ষশীল। উদাহরণ স্বরূপ অতি পরিচিত কিছু বিষয় পেশ করা যেতে পারে। যেমনঃ বিগতদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নামে ও ভাস্কর্যের বা শিল্পের নাম করে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে শহীদ মিনার, স্মৃতি সৌধ, শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন, স্বাধীনতা সৌধ, অপরাজেয় বাংলা, 'সাবাস বাংলাদেশ' নির্মাণ, নেতা-নেত্রীদের ছবি ও চিত্র অংকন ও তা অফিসে-আদালতে, ঘরে-বৈঠক খানায় ও দর্শনীয় স্থানে টাঙ্গিয়ে রাখা, তাতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, তার সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন, নগ্নপদ প্রভাত ফেরী, পহেলা বৈশাখে বানর-হনুমান, সাপ-হুঁতোম পেঁচার মুখোশ পরিধান, রাস্তায় বসে শানকিতে করে পান্তা ভক্ষণ, প্রগতির নামে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক লজ্জার বাঁধন ছিন্ন করার যাবতীয় কলা-কৌশল অবলম্বন, মেয়েদেরকে পুরুষের পাশাপাশি সকল কাজে অংশগ্রহণে প্ররোচনা দান, ক্ষমতায়নের নামে তাদেরকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ও শাসন বিভাগের বিভিন্ন স্তরে পুরুষের পাশাপাশি সংখ্যানুপাতিক সুযোগ দানের ব্যবস্থাকরণ, যেনা- ব্যভিচারের মত চিরন্তন ঘৃণ্য বিষয়টিকেও 'ফ্রি সেক্স' বা অবাধ যৌনাচারের নামে এবং দেহ ব্যবসায়ে নিয়োজিত পতিতাদেরকে 'যৌনকর্মী' আখ্যায়িত করে এটাকেও মর্যাদাকর বৈধ ব্যবসার সম্মান প্রদানের চেষ্টা, আধুনিক সাহিত্যের নামে যৌন সুঁড়সুঁড়িমূলক গান, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি পর্ণো ও কু-সাহিত্য রচনা, ছবি ও চলচ্চিত্র শিল্পের নামে সিনেমা-থিয়েটার ও টিভি পর্দায় নারী-পুরুষের ঢলাঢলি ও আদিম রসের ছড়াছড়ি, বাসে-ট্রেনে ও বৈঠকাদিতে বসে বিলাসভঙ্গিতে বিড়ি-সিগারেটের বঙ্কিম ধোঁয়া উদগীরণ, রাজধানীর ও বড় বড় শহরগুলির বিশেষ বিশেষ হোটেল গুলিতে কিংবা তথাকথিত মডেল টাউন গুলির কারুকার্য খচিত প্রাসাদোপম অট্টালিকা সমূহের হল রুমের নিয়নবাতির আলো-আঁধারীর নীচে অনুষ্ঠিত 'জংলী রাত'গুলিতে পারস্পরিক বধূ বিনিময়, বলড্যান্স ও অবশেষে মদে চুর হয়ে অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি না বলতে পারা বহু কিছু পশ্চাচরণ।

প্রশ্ন ওঠে সাম্প্রদায়িকতা বলতে কি বুঝায়? এর অর্থ যদি নির্দিষ্ট ধর্মীয় দলীয়তা হয়, তাহ'লে মুসলমান সহ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বাংলাদেশ ছাড়তে হবে। অথবা তাদেরকে স্ব স্ব ধর্ম ত্যাগ করে ধর্মহীন হ'তে হবে। আর যদি সাম্প্রদায়িকতা বলতে রাজনৈতিক দলীয়তা বুঝানো হয়, তাহ'লে তো বন্ধুদের দিন-রাতের সাধনা তথাকথিত গণতন্ত্রের জয়গান বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ গণতন্ত্রের নামে সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক সন্ত্রাসে সমাজ এখন বিপর্যস্ত। প্রচলিত দলতান্ত্রিক সাম্প্রদায়িকতার হিংস্র ছোবল হ'তে বাঁচার জন্য মানুষ অন্যত্র পথ খুঁজছে। তাহ'লে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ কি কেবলই ধারণা মাত্র? কেবলই ইউটোপিয়া? আসলে বন্ধুরা কি চান তারা নিজেরাই জানেন না। সাম্প্রদায়িকতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা ইত্যাকার শব্দগুলি কম্যুনিষ্ট নামধারীরা এক সময় খুবই বলতেন। অথচ এটা যে স্রেফ ধোকাবাজি ছিল, সেকথা আজ প্রমাণিত সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে কম্যুনিজমের স্বর্গভূমি রাশিয়া, চীন ও তাদের সমগোত্রীয় রাষ্ট্রগুলিতে।

প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে। আগুনে হাত দেওয়াটা ক্রিয়া, পুড়ে যাওয়াটা প্রতিক্রিয়া। পানিতে হাত দেওয়াটা ক্রিয়া, ভিজে যাওয়াটা প্রতিক্রিয়া। লোহার প্রতি চুম্বকের আকর্ষণ তার স্বাভাবিক ক্রিয়া, দু'য়ের মিলন হ'ল প্রতিক্রিয়া। নারী ও পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ লোহা ও চুম্বকের ন্যায় স্বাভাবিক ক্রিয়া। দূরে রাখলে বা পর্দার মাধ্যমেই কেবল এর প্রতিক্রিয়া হ'তে মুক্ত থাকা সম্ভব। যেমন নেগেটিভ-পজেটিভ দু'টি ক্যাবলের একত্র ব্যবহার তখনই সম্ভব হয়, যখন উভয় ক্যাবলে লাল বা কালো নিরাপদ কভার দিয়ে মুড়ে রাখা হয়। নইলে উভয়ের মিলনের প্রতিক্রিয়ায় ধ্বংস সুনিশ্চিত হবে। তথাকথিত উদারতাবাদী অসাম্প্রদায়িক ভাইয়েরা উপরোক্ত স্বভাবজাত বিষয়গুলিকে বিশেষ করে নারী-পুরুষের পারস্পরিক লজ্জাবোধ ও পর্দা-পুশিদার বিষয়টিকে কঠিনভাবে অস্বীকার করতে চান এবং এটাকে দারুণ প্রতিক্রিয়াশীলতা বলতে চান। যদিও তাঁরা নিজেরাও পারেন না নিজের স্ত্রী ও যুবতী আত্মজাকে এক নজরে দেখতে। স্বভাবজাত প্রতিক্রিয়া তাদের মধ্যেও হয়ে থাকে। কেননা চেতনাহীন বা প্রাণহীন লাশেরই কেবল প্রতিক্রিয়া হয় না। বাকী সবেরই মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া থাকবে- এটাই স্বাভাবিক। জগত সংসারের এই স্বাভাবিক বিষয়টি অস্বীকার করে কোন মতবাদ স্থায়ীভাবে টিকতে পারে না। বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্তা হ'লেন আল্লাহ। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যকার স্বভাবের ভিন্নতা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। মানুষের মধ্যে চেতনা, জ্ঞান ও কর্মশক্তির দ্যোতনা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। মানুষের সমাজ পরিচালনার বিশ্বজনীন বিধান প্রেরণ করেছেন আল্লাহ। 'লওহে মাহফূযে' সংরক্ষিত সর্বশেষ সেই বিশ্ববিধান নাযিল হয়েছে 'কুরআন' রূপে। যার বাস্তব ধর্মীয় ও সামাজিক রূপ হ'ল 'ইসলাম'। ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী জীবন যাপন করার মধ্যেই রয়েছে মানুষের পারস্পরিক অধিকার রক্ষার গ্যারান্টি। রয়েছে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি-সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। রয়েছে স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যকার সামঞ্জস্য বিধানের চিরন্তন মূলনীতি।

বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায় আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি। এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য হ'ল পারস্পরিক পরিচিতি। মানুষ হিসাবে সকলের অধিকার সমান। সকলেই এক আদম ও হাওয়ার সন্তান। মর্যাদার মানদণ্ড হ'ল স্রেফ তাক্বওয়া বা আল্লাহ ভীতি। কেননা আল্লাহ ভীতিই হ'ল প্রকৃত মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার একমাত্র হাতিয়ার। তাই অসাম্প্রদায়িক বলতে যদি সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল বনু আদমের প্রতি সমান ব্যবহার ও ন্যায় বিচার বুঝায়, তবে তা কেবল আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান নিঃশর্তভাবে মেনে চলার মাধ্যমেই সম্ভব। আল্লাহ সৃষ্ট আলো বাতাস যেমন সবার জন্য সমান, আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান তেমনি সবার জন্য সমান। আল্লাহ সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিধান আমরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মেনে চলতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকায় আমরা তাঁর প্রেরিত অহি-র বিধান আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে মেনে চলতে ব্যর্থ হচ্ছি। আর সেকারণেই মানুষের জীবনে নেমে আসছে ক্রমাগত অশান্তির দাবদাহ। সৃষ্টি হয়েছে সাম্প্রদায়িক-অসাম্প্রদায়িকের অবান্তর ভেদরেখা। আমরা কি আল্লাহ্‌র বান্দা হিসাবে সকল মানুষকে মানুষ হিসাবে ভাবতে পারি না? আমরা কি পারিনা নেককার বান্দাদেরকে ভাই হিসাবে বুকে টেনে নিতে? আল্লাহভীরু নেককার মানুষগুলোই কি সমাজের স্তম্ভ নয়? হৌক সে বাঙ্গালী, হৌক সে বিহারী-পাঞ্জাবী, হৌক সে আফগান বা আমেরিকান, আল্লাহভীরু হ'লে সে আমার ভাই। এই দর্শনই কেবল মানব সমাজের ভেদাভেদ দূর করতে পারে। তাই অসাম্প্রদায়িক নয়, চাই তাক্বওয়াশীল বাংলাদেশ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! (স.স.)।

প্রবন্ধ

আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলিম নির্যাতন
(১৯৪২-৭৮ খৃঃ)

*মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান**

আধুনিক বিশ্বের এক বিরাট অংশ জুড়ে প্রায় অর্ধশত মুসলিম রাষ্ট্র সভ্য রাষ্ট্রসভার সদস্য হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সতেজ চেহারার কাছে মুসলিম বিশ্বের মানচিত্র আজ বিবর্ণ। রক্তক্ষয়, হত্যা, ধর্ষণ ও সীমাহীন নিপীড়নের মুখে মুসলমানদের জীবন ও অস্তিত্ব এখন হুমকির সম্মুখীন। বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসন এবং ইহুদী-খৃষ্টান চক্রের সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের ফলে মুসলিম বিশ্ব আজ এক কঠিন অধ্যায় অতিক্রম করছে। ইসলামের কথা বলা কিংবা মুসলিম হিসাবে পরিচয় দান করাই যেন চরম অপরাধ। ইহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু এমনকি মুসলিম পরিচয়ধারী মুনাফিক্ব গোষ্ঠীও ইসলামের সুমহান আদর্শকে ধ্বংস করতে দৃঢ় শপথে ঐক্যবদ্ধ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলিম ট্রাজেডি যেন প্রতিদিনের বাধ্যতামূলক সংবাদ। ফিলিস্তীনে চলছে তিন যুগের অধিককাল ধরে ইহুদীবাদের নারকীয় তাণ্ডবতা। বসনিয়ায় চলেছে সভ্যতার সবচেয়ে জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ, ধ্বংস এবং নারী ধর্ষণের উন্মত্ততা। কাশ্মীরসহ গোটা ভারতে মুসলমানদের রক্ত ঝরছে। বসনিয়া, চেচনিয়া, ফিলিস্তীন, ফিলিপাইনের মরো ও কাশ্মীরের মত আরাকানের মুসলমান সমস্যাও মুসলিম জাহান এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বের অন্যতম প্রধান ট্রাজেডি। পৃথিবীর প্রচার মিডিয়ার আড়ালে একান্ত নিভৃতে বৌদ্ধবাদী সামরিক শাসক ও মগদের অমানবিক নির্যাতনে সেখানকার মুসলিম জাতিসত্তা বিলীন হবার পথে। নির্যাতিত মুসলিম বিশ্বের মধ্যে আরাকানী মুসলমানদের অবস্থা (১৯৪২-৭৮ খৃঃ) বর্ণনা করাই এ প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

আরাকানে মুসলিম প্রভাবঃ

বর্তমানে মিয়ানমার রাষ্ট্রের অন্তর্গত 'রাখাইন ষ্টেট' নামে পরিচিত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী একটি প্রদেশের নাম আরাকান। সেখানকার অধিকাংশ মুসলমান রোহিঙ্গা নামে পরিচিত। বর্তমানে তাদের অবস্থা আরাকানে যেমন সংকটপূর্ণ, তেমনি বাংলাদেশের জন্যও বিরাট সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। এ সমস্যার সূচনা মূলতঃ ১৯৪২ সাল থেকে। তারপর থেকে বিভিন্ন সময় স্থানীয় মগদের নির্যাতনের প্রেক্ষিতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান নিজস্ব বসতবাড়ী ছেড়ে বাংলায় চলে আসে।

অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে চন্দ্র বংশীয় রাজা মহৎ-ইঙ্গ-চন্দ্রের (৭৮৮-৮১০ খৃঃ) রাজত্বকালে আরবীয় মুসলিম বণিকগণ নৌবহর নিয়ে আরাকানের আকিয়াব বন্দরসহ দক্ষিণ-পূর্ব চীনের ক্যান্টন বন্দর পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ও ইসলাম প্রচারের জন্য চলে আসেন। এ সময় একটি আরবীয় বাণিজ্য বহর রাহাম্বী দ্বীপের পাশে বিধ্বস্ত হয় এবং স্থানীয় জনগণ তাঁদের উদ্ধার করে। আরাকানরাজ তাঁদের বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত আচরণ লক্ষ্য করে সেখানেই বসতি স্থাপনের অনুমতি দেন।[১]

দশম ও একাদশ শতাব্দী থেকে মুসলিম বণিকদের পাশাপাশি বদরুদ্দীন (বদরশাহ)[২] সহ অনেক অলি-আউলিয়া ইসলাম প্রচারের জন্য আরাকানে আসেন এবং সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলামের ঔদার্য ও মহানুভবতা প্রচার করেন। এ সময় আরাকানে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইসলামের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[৩] সে সময় মুসলমানগণ এতটা জনপ্রিয় ছিল যে, তারা বাণিজ্য বিস্তারের পাশাপাশি ইসলামের সুমহান ঔদার্য রাজশক্তি ব্যতীত সকল স্তরকেই প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল।[৪]

পঞ্চদশ শতাব্দীতে চন্দ্র-সূর্য বংশের রাজা অযুথুর পুত্র নরমিখলা স্বীয় চাচাকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করে। অতঃপর ক্ষমতাচ্যুত আরাকান রাজার আমন্ত্রণে বার্মার রাজা মেং শো আই (Meng Show Wai 1401-22) ১৪০৬ সালে ৩০ হাযার সৈন্য নিয়ে আরাকান আক্রমণ করলে নরমিখলা প্রাণ ভয়ে গৌড়ে এসে আশ্রয় নেন এবং ১৪৩০ সালে বাংলার সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ শাহ সেনাপতি ওয়ালী খানের নেতৃত্বে ২০ হাযার সৈন্য দিয়ে তাঁর স্বদেশভূমি পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেন। ওয়ালী খান রাজ্য জয় করে নিজেকেই আরাকানের স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষণা দেন। নরমিখলা পুনরায় গৌড়ে পালিয়ে এলে পরের বছর সিন্ধি খানের নেতৃত্বে আবারো ৩০ হাযার সৈন্য পাঠিয়ে তাঁর স্বদেশভূমি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। নরমিখলা পিতৃভূমি উদ্ধারের পর লঙ্গিয়েত থেকে রাজধানী স্থানান্তর করে লেম্রু নদীর তীরে ম্রোহং নামক শহরে স্থাপন পূর্বক রাজ্য শাসন করতে থাকেন। বাংলা থেকে আগত দু'পর্বে প্রায় ৫০ হাযার গৌড়ীয় সৈন্য আর স্বদেশে ফিরে না এসে আরাকানেই স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে।[৫]

* পি,এইচ-ডি গবেষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান, তাওয়ারিখে ইসলামঃ বার্মা ওয়া আরাকান (কলিকাতাঃ দি ষ্টার আর্ট প্রেস, ১৯৪২), পৃঃ ২৪; আবদুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি (চট্টগ্রামঃ জোবাইদা বানু চৌধুরী, ১৯৮০), পৃঃ ১০১; R.B. Smart, Burma Gazetteer Akyab District, Vol. A (Rangoon: Burma Government Printing & Stay, 1959), p. 17.

২. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খন্ড (ঢাকাঃ বর্ণ মিছিল, ১৯৭৮), পৃঃ ৮৪৮।

৩. মাইন্ট আং, ইমদাদুল হক সরকার অনুদিত, বার্মায় ইসলাম, দৈনিক আজাদ, ২৩ জানুঃ ১৯৮৭।

৪. শাহ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, বার্মার রোহিঙ্গা মুসলমান, দৈনিক ইনকিলাব, ২০ এপ্রিল, ১৯৯০।

৫. Smart, Burma Gazetteer, p. 7.

নরমিখলা প্রথমতঃ স্বীয় রাজধানী সুরক্ষিত করার মানসে তার রাজধানীর পূর্ব-দক্ষিণে সেনা ছাউনি তৈরী করে সৈনিকদের অনেককেই পুনর্বাসন করেন এবং গৌড়ীয় স্থাপত্যরীতিতে সন্দিকান বা সিদ্ধিখান মসজিদ নির্মাণ করেন।[৬] পরবর্তীকালে তাদের বংশ বিস্তারের ফলে সেখানকার রওয়ানা, নেদানপাড়া, মোয়াল্লেমপাড়া, সাম্পুরিক, কুয়িপাড়া, কামারপাড়া প্রভৃতি মুসলমান জনপদ গড়ে উঠেছিল। এ সব এলাকায় সাতটি পাকা মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান।[৭]

দ্বিতীয়তঃ বার্মা রাজ্যের সীমান্তবর্তী দক্ষিণ আরাকানের স্যান্ডুয়ে (চাঁদা ও চকপেয় কেপ্রু) সীমান্তে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে সেখানে বাংলা থেকে আগত সেনাদের জন্য দু'টি সেনানিবাস স্থাপন করেন। তারাও মগরমণী বিয়ে করে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়। তাদের বংশ বিস্তারের ফলে পরবর্তীকালে স্যান্ডুয়ের শুয়েজুবি, চানবি, নাজবি, জাদি, পেরাং, চাংদয়ক, থাডে, ছায়াডো, সিবিন ও চকপিয়ুর চৌকনেমু, ছনে, জালিয়াপাড়া, মেহেরবণু প্রভৃতি মুসলিম জনপদ গড়ে উঠেছিল। এ জনপদগুলি কালাপাঞ্চন, কোয়ালং, গৌলংগী নামে খ্যাত।[৮]

এছাড়া নরমিখলা আরাকান জয়ের পর চট্টগ্রাম থেকে অনেক মুসলমান সেখানে গিয়ে স্থানীয় রমণীদের বিয়ে করে অনাবাদী অঞ্চলে স্থায়ী আবাস গড়ে কৃষি কাজ শুরু করেছিল।[৯] তাছাড়া ১৫৭৫-৭৬ সালে গৌড় ধ্বংস কালে বাংলার কিছুসংখ্যক মুসলমান চক্রশালা হয়ে ম্রোহং-য়ে উপস্থিত হয়; যাদের মধ্যে কররাণী সুলতানের আমীর-ওমারা প্রভৃতি সম্মানিত ব্যক্তিও ছিলেন। তাঁরা সেখানে যথাযথ মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভ করেন।[১০]

সিংহাসন পুনরুদ্ধার করার পর নরমিখলা চার বছর (১৪৩০-১৪৩৪ খ্রীঃ) রাজত্ব করেন। এ সময় থেকে আরাকানরাজ নরমিখলা বাংলার সুলতানদের মত তাঁদের মুদ্রার এক পৃষ্ঠায় ফারসী অক্ষরে কালেমা ও মুসলমানী নাম লেখার রীতি চালু করেন। তাঁর পরবর্তী রাজাগণ বাংলার অধীনতা থেকে মুক্ত হয়েও মুদ্রার এক পৃষ্ঠে ফারসী অক্ষরে কালেমা ও বৌদ্ধ নামের সঙ্গে মুসলমানী নাম ব্যবহার করতেন।[১১] ১৪৩০-১৬৪৫ সাল পর্যন্ত দু'শ পনের বছর যাবৎ স্বাধীন আরাকানের রাজাগণ তাঁদের মুদ্রায় মুসলমানী নাম ব্যবহার করলেও এ দীর্ঘ সময় বাংলার মুসলমান শাসকদের সাথে তাদের মোটেই সদ্ভাব ছিল না। অথচ তারা দেশে মুসলমানী রীতি-নীতি ও আচার-পদ্ধতি পুরোপুরিভাবে মেনে আসছিল। কারণ আরাকান রাজাগণ তাঁদের নিজস্ব সভ্যতা, রাষ্ট্রনীতি ও আচার ব্যবহারের চেয়ে মুসলমানদের সভ্যতা, রাষ্ট্রনীতি ও আচার ব্যবহার অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত হিসাবে পেয়েছিল। বাংলার মুসলমান রাজশক্তির সাথে তাঁদের বিরোধ থাকলেও মুসলমান জাতির প্রতি তাঁদের বিদ্বেষ ছিল না। তাই তাঁদের সৈন্যবিভাগের প্রধান সেনাপতি থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক বিশিষ্ট বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার পদ পর্যন্ত মুসলমানদের হাতে সমর্পণ করেছিলেন।[১২]

ম্রাউক-উ-রাজবংশের রাজাগণ ১৪৩০-১৭৮৫ খ্রীঃ পর্যন্ত ৩৫৫ বছরকাল আরাকানে রাজত্ব করেন।[১৩] এ রাজবংশ ছিল আরাকানের জন্য বিশেষতঃ আরাকানী মুসলমানদের জন্য আশির্বাদ। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ম্রাউক-উ-রাজবংশ বিশেষ করে ১৪৩০ থেকে ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ২৫৪ (দু'শ চুয়ান্ন) বছরের শাসনামলে শাসকদের প্রজ্ঞাও যেমন ছিল, তেমনি ছিল ইসলাম প্রিয়তা। তাঁরা বাঙ্গালী, আরবীয়, ইরানী, কিংবা আরাকানী মুসলমানকে প্রধানমন্ত্রী, সৈন্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, কাযী, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী পর্যন্ত যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দান করে রাজ্যের উন্নতি বিধানে তৎপর ছিলেন।[১৪] ফলে রাজনীতি, সমরনীতি, দরবারের আদব-ক্বায়দায় ইসলামী রীতি-পদ্ধতি অনুসৃত হ'ত। তাছাড়া সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনেও ইসলামী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সেখানে যে পর্দা প্রথার প্রচলন শুরু হয়, তা খাঁটি আরবীয় মুসলমানদের সংশ্রবের ফল।[১৫] নৌবিদ্যায় প্রাচীনকালে আরবীয় মুসলমান বণিকগণ দক্ষ ছিলেন। তাঁদের সংশ্রবে সেখানকার মুসলমানরাও নৌবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে।[১৬] এ এলাকার বিভিন্ন জায়গার আরবী নাম, কাব্যরীতিতে আরবী ভাষার প্রয়োগ এসবই ইসলামী প্রভাব প্রসূত।[১৭]

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলিম অমাত্যবর্গের অনন্য ভূমিকা ছাড়াও তাদের আর একটি বড় অবদান হ'ল, তারা মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদেরকে পৃষ্টপোষকতা দিয়ে বাংলা

৬. *আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃঃ ২০৯-৫৪।*
৭. *মাহবুব-উল আলম, চট্টগ্রামের ইতিহাস নবাবী আমল (চট্টগ্রামঃ নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৬৫), পৃঃ ৫৫-৫৭।*
৮. *তদেব।*
৯. *M.S. Collis, Arakan's place in the civilization of the Bay, JBRS, 50th Anniversary publication, No. 2, Rangoon, 1960, p. 486.*
১০. *আহমদ শরীফ, সৈয়দ সুলতান তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৩৭৯ বাং), পৃঃ ৩৪।*
১১. *M.S. Collis, Arakan's place in the civilization of the Bay, p. 491.*
১২. *মুহাম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, আরাকান রাজসভায় বাঙালা সাহিত্য, মুহাম্মদ এনামুল হক্ব রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃঃ ৩৬; মাহবুব উল আলম, চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পৃঃ ৫৪-৫৭।*
১৩. *Harvey, History of Burma: From the Earliest Time to 10 March 1824, The Begining of the English Conquest (London: Frank Cass & Co., 1967), pp. 137-49.*
১৪. *আরাকান রাজসভায় বাঙালা সাহিত্য, পৃঃ ৩৬; মাহবুব উল আলম, চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পৃঃ ৫৪-৫৭; Yunus, A History of Arakan: Past & Present (Chittagong: Magenda Color, 1994), pp. 35-36.*
১৫. *অমৃতলাল বালা, আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), পৃঃ ৬৭।*
১৬. *তদেব, পৃঃ ৬৮।* ১৭. *তদেব।*

সাহিত্যের ভিত্তিমূল শক্ত করেছিলেন। মূলতঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলিম প্রভাবিত আরাকান রাজসভায় মুসলমান কবিদের হাতেই বাংলা সাহিত্য পরিপুষ্ট হচ্ছিল; যার ফলাফল বহুমুখী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।[১৮]

প্রাচীন যুগের হিন্দু কবিরা সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য থেকে অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু আরাকান রাজ দরবারে আশ্রিত মুসলমান কবিরা কেবল সংস্কৃত নয়, হিন্দী, আরবী, ফারসী প্রভৃতি উন্নত ভাষা-সাহিত্য থেকে অনুবাদ করে যেমন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন করেন; তেমনি তাঁরা নিজস্ব বিশ্বাস ও চেতনার উপর ভিত্তি করে পুঁথি সাহিত্য রচনার মাধ্যমে বাংলা ভাষার ভিত্তিকে মযবূত করেছেন। তাঁরাই বাংলা সাহিত্যে মানবীয় প্রেমকে কেন্দ্রীয় শক্তিরূপে পরিকল্পনা করে সাহিত্য রচনার পথিকৃৎ।[১৯] আরাকানের মুসলিম কবিগণ বাংলা সাহিত্যকে বিষয় বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ করে ভারতীয় উন্নততর হিন্দী ভাষার সাথে যুক্ত করেন এবং নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সুমধুর ফারসী সাহিত্যের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে নানাভাবে সম্প্রসারিত করেছেন।[২০] আরাকান রাজসভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে বিকাশ সাধিত হয় তার তুলনা আর কোথাও মেলে না।[২১] কবিরা যেমন ছিলেন ধার্মিক মুসলমান, তেমনি তাঁদের পৃষ্টপোষক, আশ্রয়দাতা ও আদেশ দাতারাও (রাজার অমাত্যবর্গ) ছিলেন একই পথের পথিক। তাঁদের কার্যরীতির ভাষা ছিল আরবী-ফার্সী।[২২]

আরাকান হিন্দু-মুসলিম ও বৌদ্ধ জাতিগোষ্ঠীর মিলন কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হ'লেও ইসলাম তাদের উপর এমন ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, এ বিচিত্র সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় লালিত-পালিত হয়েও তারা সব রকমের দ্বন্দ্ব-কলহ ও জাতি বৈরীকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিল। ইসলামের শান্তির বাণী তাদের এ মূলমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল।[২৩] ফলে আরাকানের মুসলিম কবিগোষ্ঠীর কাব্যাদর্শ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষের উপাদেয় সামগ্রী হ'তে পেরেছিল। কিন্তু আরাকান রাজ্যের বিশৃংখলা ও মুসলমানদের ক্ষমতা হ্রাসের কারণে সপ্তদশ শতাব্দী শেষ না হ'তেই আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের চর্চা কমে যায়।[২৪]

মোগল সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে বাংলার মোগল সুবাদার শাহজাদা মুহাম্মাদ সুজা দাক্ষিণাত্যের সুবাদার শাহজাদা আওরঙ্গজেবের সাথে পরাজিত হয়ে ১৬৬০ সালের ২৬ আগষ্ট আরাকানের রাজধানী মোহং-য়ে পলায়ন করে আরাকানরাজ চন্দ্র সুধর্মার দরবারে আশ্রয় নেন এবং এক পর্যায়ে সেখানেই স্বপরিবারে নিহত হন। তাঁর অনুচরবর্গ আরাকানেই থেকে যায়। সম্রাট আওরঙ্গজেব ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ কল্পে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খানকে নির্দেশ দেন। তিনি ১৬৬৬ সালে আরাকানী বাহিনী ও মগ জলদস্যুদের পরাজিত করে সমগ্র চট্টগ্রাম দখল করেন।[২৫] অতঃপর ১৬৮৪ সালে আরাকানরাজ সান্দা থু ধম্মার মৃত্যুর পর থেকে ক্রমশঃ আরাকানের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। বিশেষতঃ ১৭১০ সালে সান্দা উইজ্যা আরাকানের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে সামন্তদের ক্ষমতা বেড়ে যায়। ফলে আরাকানরাজ ক্রমশঃ শক্তিহীন হয়ে পড়ে এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বে রাজ্যের স্থিতিশীলতাও বিনষ্ট হ'তে থাকে। সামন্তদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে রাজ্যে স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হবার সুযোগে বর্মীরাজ বোধপায়া ১৭৮৫ সালে আরাকান দখল করেন।[২৬] ১৮২৩ সালে ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের পর আরাকান কোম্পানীর শাসনাধীনে এলে সেখানে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে এবং আরাকান থেকে পালিয়ে আসা আরাকানীদের অধিকাংশই পুনরায় স্বদেশে ফিরে যায়।

এছাড়া কোম্পানী ও বৃটিশ শাসনামলে আরাকান ও বার্মা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে এলে বাংলা এবং ভারতের অনেক মুসলমান ব্যবসা ও চাকরির উদ্দেশ্যে আকিয়াব, রেঙ্গুনসহ বিভিন্ন শহরে গমন করে। অধিকাংশ লোক কাজ শেষে স্বদেশে ফিরলেও কেউ কেউ সেখানেই স্থায়ী আবাসন গড়ে বসবাস করতে থাকে। এভাবে অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে সময়ের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পর্যায়ে আরাকানে মুসলিম বসতি গড়ে ওঠে এবং এটি পুরোপুরিভাবে মুসলিম প্রভাবিত এলাকায় পরিণত হয়।[২৭]

রোহিঙ্গা নির্যাতন (১৯৪২-৭৮ খৃঃ):

রোহিঙ্গারা ১৯৪২ সালের পূর্ব পর্যন্ত আরাকানে দু'একটি বড় ধরনের দুর্ঘটনা ছাড়া ধর্মীয় স্বাধীনতা থেকে শুরু করে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছিল এবং সেখানকার মগ সম্প্রদায়ের সাথে তাদের আত্মিক সম্পর্ক এত গভীর ছিল যে, স্থানীয় মগরা ইয়োমা পাহাড়ের উচ্চশৃংগের অপর পাড়ের বৌদ্ধদের চেয়ে প্রতিবেশী রোহিঙ্গাদেরকে বেশি আপন মনে করত।[২৮] কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে গোটা উপমহাদেশের বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের

১৮. তদেব।
১৯. আরাকান রাজসভায় বাঙালা সাহিত্য, পৃঃ ৯৬-৯৭।
২০. তদেব। ২১. তদেব।
২২. আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি, পৃঃ ৬৮।
২৩. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খন্ড (কলিকাতাঃ ইষ্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৭৫), পৃঃ ৫৪৮।
২৪. তদেব।

২৫. M. Siddiq Khan, The Tragedy of Mrauk-U-(1660-1666), JASP, vol. XI, No. 2, August 1966, p. 198.
২৬. রতন লাল চক্রবর্তী, বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক, ১৭৮৫-১৮২৪ (ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪), পৃঃ ৯; আবদুল মাবুদ খান, চট্টগ্রাম জেলায় আরাকানী বসতির ইতিহাস ও প্রসঙ্গ কথা, ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ১৫শ ও ২০বর্ষ সম্মিলিত সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৮৮ ও চৈত্র ১৩৯৩, পৃঃ ৮৯।
২৭. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৪৪৪-৪৫; মাহবুবুল আলম, চট্টগ্রামের ইতিহাস নবাবী আমল (চট্টগ্রামঃ নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৬৫), পৃঃ ৭২।
২৮. সামিউল আহমদ খান, রোহিঙ্গা মুসলমান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, ২৩ বর্ষ, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩, পৃঃ ২২৬।

সুবাদে বার্মায় থাকিন পার্টির (Thakin Party)[২৯] নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হ'লে পার্টির নেতৃবৃন্দ আরাকানের মগ নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পর্ক গড়ে মুসলমান-মগদের মাঝে স্থায়ী বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাধীনতা উত্তর আরাকানকে বর্মীভুক্ত রাখার পরিকল্পনা করে। তারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মগদের মাঝে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে।[৩০] ১৯৩৭ সালে বৃটিশ-ভারত থেকে বৃটিশ বার্মা আলাদা হবার পর বৃটিশ প্রশাসন Home Rule (Local Self Government of 1937) জারি করে বার্মায় অভ্যন্তরীণ স্থানীয় সরকার গঠনের বিষয় অনুমোদনের মাধ্যমে বর্মী নেতৃবৃন্দের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেয়। ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উস্কানী দিয়ে ১৯৩৮ সালে রেঙ্গুনসহ বার্মার নীচু অংশে (Lower Burma) মুসলিম নিধনযজ্ঞ চালিয়ে ৩০,০০০ মুসলমানকে হত্যা করে।[৩১] এ সূত্র ধরে ১৯৪০ সালে মুসলমানদের উপর বৌদ্ধ ধর্ম ও এর প্রচারক গৌতম বুদ্ধের অবমাননার অভিযোগ এনে Do Bama Asciayone বা 'থাকিন পার্টি' নামে বর্মী জাতীয়তাবাদী চরমপন্থী দল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা করে; যার পরিণতি হিসাবেই ১৯৪২ সালে আরাকানে মুসলিম নিধনযজ্ঞ সংঘটিত হয়।[৩২]

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হ'লে 'থাকিন পার্টি'র নেতৃবৃন্দ বার্মার স্বাধীনতার অঙ্গীকার না দেওয়া পর্যন্ত বৃটিশকে সমর্থন না দেবার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানালে বৃটিশ সরকার অনেক জাতীয়তাবাদী নেতাকে গ্রেফতার করে। এ সময় অং সান (Aung San)-এর নেতৃত্বে ত্রিশ সদস্যের একটি দল গোপনে জাপানে পালিয়ে গেলে জাপান সরকার এদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেন এবং জাপানের অর্থ, প্রশিক্ষণ ও নিজস্ব তত্ত্বাবধানে Burma Independent Army (BIA) গঠিত হয়।[৩৩] ১৯৪১ সালে জাপানী বাহিনীর সাথে BIA বার্মায় প্রবেশ করে এবং ১৯৪১ সালের ২৩ ডিসেম্বর জাপানীদের কাছে রেঙ্গুনের পতন ঘটলে BIA-এর শক্তি বৃদ্ধি পায়। ১৯৪২ সালের ২৩ মার্চ জাপানী বিমানবাহিনী আকিয়াবের উপর প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করার ফলে অনেক বৃটিশ, গুর্খা (Gorkha), রাজপুত (Rajput) এবং কারেন (Karen) সৈন্য নিহত হয়।[৩৪] জাপানীদের আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে বৃটিশ শক্তি আরাকান ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফলে আরাকানে এক প্রশাসনিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এ সময় BIA-এর কিছু সদস্য জাপানী সেনাবাহিনীর সাথে অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে আরাকানে এলে স্থানীয় মগরা BIA-এর সহযোগিতায় আরাকানের নিরাপত্তা ও সেনাবাহিনীর অস্ত্র-সস্ত্র হস্তগত করে আকিয়াব, রাছিডং ক্যাকথ, মাব্রা, মিনবিয়া, পুনাজুয়ে, বাহারপাড়া, মহামুনী পাকটুলিসহ গোটা আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়, যা '৪২ মাস্যাকার' হিসাবে কুখ্যাত।[৩৫] নারী, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে হত্যা, লুটতরাজ, নারী ধর্ষণসহ গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি, উন্মত্ত হামলাকারীরা মৃত মানুষের মস্তক বর্ষার মাথায় বিঁধে তাণ্ডব নৃত্যের মাধ্যমে বিজয়ানন্দ উদযাপন করেছে।[৩৬]

আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য লাখ লাখ লোক দুর্গম 'আপক' গিরিপথ দিয়ে উত্তর আরাকানের মংডু, বুচিদং এলাকায় পলায়ন করার সময় পথিমধ্যে হাযার হাযার লোক মৃত্যুবরণ করে। নাফ নদী ছিল নারী, শিশু, বৃদ্ধ-বনিতাসহ অসংখ্য রোহিঙ্গা মুসলমানের লাশে পরিপূর্ণ।[৩৭] এ হত্যাকাণ্ডে প্রায় ১ লাখ রোহিঙ্গাকে হত্যা এবং প্রায় ৫ লাখ রোহিঙ্গাকে বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করা হয়। অনেকে সঊদী আরব, পাকিস্তান, ভারত, ইরান, ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও পার্শ্ববর্তী দেশসহ বাংলার বিভিন্নস্থানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।[৩৮] বৃটিশ সরকার রংপুরের সুবীর নগরে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের জন্য উদ্বাস্তু শিবির স্থাপন করেছিল। উত্তর আরাকান হ'তে বহু দূরে রংপুরের সুবীর নগরে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তুর একটি ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল।[৩৯] কক্সবাজারের স্থানীয় প্রশাসন সমুদ্রের উপকূলবর্তী একটি এলাকার বহু উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসন করেছিল; যা এখনও 'রিফিউজি ঘোনা' নামে পরিচিত। দেশ স্বাধীন হ'লেও বার্মা সরকার এ সমস্ত উদ্বাস্তুদের আর স্বদেশে ফিরিয়ে নেয়নি।[৪০]

রোহিঙ্গারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী হ'লেও আকিয়াবসহ আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের অনেকেই প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ছিল। কেউ কেউ আবার ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্য

---

২৯. *থাকিন (THAKIN) শব্দের অর্থ মালিক। ১৯৩০ সালে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক ছাত্র DOHBAME ASIAYONE বা We Burmese Association নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এ সংগঠনের কর্মীরা নামের প্রথমে থাকিন শব্দটি লিখত বলে জনসাধারণের কাছে এটি 'থাকিন পার্টি' নামে পরিচিত হয়। দ্রঃ এন.এম. হাবিব উল্লাহ, রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস (ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ১৯৯৫), পৃঃ ১০৬।*

৩০. *আবদুল হক চৌধুরী, প্রাচীন আরাকান রোয়াঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পৃঃ ১৪৬-১৪৭।*

৩১. *মোঃ মাইমুল আহসান খান, মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থীঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (ঢাকাঃ বিশ্বসাহিত্য ভবন, ১৯৯৮), পৃঃ ৪০; আবদুল হক চৌধুরী, প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পৃঃ ১৪৭।*

৩২. *বার্মার মুসলমান মুহাম্মদ রুহুল আমিন অনূদিত, তেহরান টাইমস, ২৪ মে ১৯৮৩-এর সৌজন্যে, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, ২৩ বর্ষ, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩, পৃঃ ২১৭।*

৩৩. *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস, পৃঃ ১০৬।*

৩৪. *Mohammed Yunus, A History of Arakan: Past and Present, p. 105.*

৩৫. *আবদুল হক চৌধুরী, প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পৃঃ ১৪৭; অচিন সাঁই, আরশী নগর, দৈনিক জনতা, ২৭ নভেম্বর ১৯৯১; মোঃ শাহেদ হুসেইন, আরাকানঃ আরেক কাশ্মীর, দৈনিক সংগ্রাম, ২২ নভেম্বর, ১৯৯১।*

৩৬. *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস, পৃঃ ১০৭।*

৩৭. *তদেব।*

৩৮. *Dr. Muin-ud-Din Ahmad Khan, Muslim Communities of South-East Asia: A Brif Survey (Chittatgong: Islamic Cultural Centre, 1980) p. 54; Abdur Razzaq and Mahfuzul Haque, A Tale of Refugees Rohingyas in Bangladesh (Dhaka: The Centre for Human Rights, 1995) pp. 15-16.*

৩৯. *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস, পৃঃ ১০৭।*

৪০. *তদেব।*

করেও জীবন যাপন করত। জেনারেল নে উইন ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দেশের ব্যাংক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহ রাষ্ট্রীয়করণ করলে রোহিঙ্গা ব্যবসায়ীরা অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিশেষতঃ বিভিন্ন ইস্যুতে মগদের অত্যাচার ও লুটপাটের কারণে আতংকিত ব্যবসায়ীরা জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন শুরু করে। জেনারেল নে ইউন Burmese Way to Socialism কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে মূলতঃ বৌদ্ধধর্ম, বর্মী জাতীয়তাবাদ ও মার্কসবাদের একটি অদ্ভুত মিশ্র ব্যবস্থার প্রবর্তন করে দেশের অর্থনীতিকেও মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন করেন।[৪১] ১৯৬০ সালে বার্মার মাথাপিছু আয় যেখানে ৬৭০ ডলার ছিল, পরবর্তীতে তাঁর এ নতুন ব্যবস্থার কারণেই ২০০ ডলারে নেমে আসে।[৪২]

জেনারেল নে উইন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই রোহিঙ্গা নির্মূলের জন্য আরাকানী মগদের উস্কিয়ে দেয়। ১৯৬৪ সালে রোহিঙ্গাদের Rohingya Organization,[৪৩] The Rohingya Youth Organization,[৪৪] Rangoon University Rohingya Students Association,[৪৫] Rohingya Jamiatul Ulama,[৪৬] Arakan National Muslim Organization,[৪৭] Arakanese Muslim Youth Organization,[৪৮] এবং Rohingya Student Association[৪৯] প্রভৃতি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ নিষিদ্ধ করেন[৫০] এবং ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে Burma Broadcasting Service (BBS) থেকে নিয়মিতভাবে রোহিঙ্গা ভাষায় প্রচারিত অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করে দেন।[৫১] অতঃপর ১৯৬৬ সালে সমস্ত বেসরকারি সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[৫২]

নে উইন-এর শাসনামলে কয়েকবার মুদ্রা অচল ঘোষণার ফলে মুসলমানদের জন্য এক শাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯৬৪ সালের ১৭ মে ৫০ ও ১০০ টাকার মুদ্রামূল্য রহিত করা হ'লে আরাকানী রোহিঙ্গারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরাকানী মগরা নিজেদের মধ্যকার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও স্থানীয় BSPP-এর সদস্য থাকার সুবাদে জমাকৃত অর্থের মূল্যমান নতুন টাকা ফেরৎ পেলেও রোহিঙ্গারা তাদের ডিপোজিটকৃত টাকা ফেরৎ পায়নি।[৫৩] পক্ষান্তরে সকল ব্যবসা-বাণিজ্য ও রেশন বিতরণের সার্বিক তদারকী মগদের হাতে থাকায় মুসলমানদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ে।[৫৪] উপরন্তু ১৯৬৭ সালে বার্মায় বিশেষতঃ রাজধানী রেংগুনে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলে আরাকান থেকে চাল আমদানী করে রেংগুনে পাঠানো হয়। সরকারিভাবে রোহিঙ্গাদের মজুদকৃত খাদ্যশস্য জোরপূর্বক আদায় করে এবং সামরিক আধাসামরিক বাহিনীর লুটপাটের মাধ্যমে তাদের গোলা শূন্য করে দেওয়া হয়। একদিকে অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, খাদ্যশস্য লুট, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ এবং মুদ্রা অচল ঘোষণায় অর্থনৈতিক দৈন্যের কারণে খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে যাত্রা; অন্যদিকে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে প্রতিবাদের ভাষা কেড়ে নিয়ে সরকারিভাবে নির্যাতন চালায়। এমতাবস্থায় রোহিঙ্গাদের মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না।[৫৫]

রোহিঙ্গা নির্যাতনের অধ্যায় মূলতঃ ১৯৪২ সাল থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান হারে চরম আকার ধারণ করে। এখানে ১৯৪২-৭৮ পর্যন্ত নির্যাতনের কিছু খতিয়ান উপস্থাপন করা হ'ল।

বর্মী সরকার পরিকল্পনার ভিত্তিতে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৪টি বড় রকমের অপারেশন চালিয়ে মানবাধিকার লংঘনের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের জীবনকে বিপন্ন করে তোলে।[৫৬] নিম্নে ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রধান প্রধান ১১টি অপারেশনের বিবরণ সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হ'ল-[৫৭]

---

৪১. তদেব।

৪২. তদেব।

৪৩. এটি ১৯৫০ সালে আরাকানের মংডু শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। শামসুল আলম চৌধুরী এবং মাষ্টার বদিউর রহমান যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। সংগঠনটি ১৯৬৪ সালে নে উইন কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। [আশরাফ আলম, আরাকান হিষ্ট্রিক্যাল সোসাইটি, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রাপ্ত ॥]

৪৪. ছাত্র-যুব সমাজের মাঝে ইসলামী চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য ১৯৫৬ সালে রেঙ্গুনে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আবদুল মান্নান (U Tin Win) এবং রশীদ বা মং (Rashid Ba Maung) যথাক্রমে এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। [তদেব ॥]

৪৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের রোহিঙ্গা ছাত্রদের মাঝে ইসলামী চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৯ সালের ৩ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে ব্রহাম্মদ হুসাইন কাসিম এবং ব্রহাম্মদ খান দায়িত্ব পালন করেন। [তদেব ॥]

৪৬. রোহিঙ্গাদের মধ্যকার আলিম সমাজকে একতাবদ্ধ করার জন্য এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মাওলানা আবদুল কুদ্দুস এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। [তদেব ॥]

৪৭. সুবহান উকিলের নেতৃত্বে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। [তদেব ॥]

৪৮. আরাকানের মুসলিম যুব সমাজকে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে নৈতিকতা গঠনের নিমিত্তে ব্রহাম্মদ কাসিম (Nata Kasim) ও মং মং গিয়াই (Maung Maung Gyi) এর নেতৃত্বে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। [তদেব ॥]

৪৯. রোহিঙ্গা ছাত্রদের মাঝে দ্বীনী চেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে শাহ্ আলম ও শাহ্ লতীফ-এর নেতৃত্বে রেঙ্গুনে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। উপরোল্লেখিত সংগঠনসমূহ ১৯৬৪ সালে নে উইন কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। [তদেব ॥]

৫০. A History of Arakan, pp. 149-50.

৫১. Ibid.

৫২. National Refugee Week, The Refugee Council of Australia, 17 June, 1992, p. 37.

৫৩. A History of Arakan, pp. 50-51.

৫৪. Ibid.

৫৫. Ibid.

৫৬. মুহাম্মাদ তাহের জামাল নদভী, সারযমীন আরাকান কি তাহরীকে আযাদী তারীখী পাচ মানযার মে (চট্টগ্রামঃ আরাকান হিষ্ট্রিক্যাল সোসাইটি, ১৯৯৯), পৃঃ ৩১৮; Insaf, Rohingyas Voice & Vision, vol. 3, Issue 3-4, 30 September, 1986, Arakan, Burma, p. 7.

৫৭. Ibid.

আরাকানে রোহিঙ্গা বিরোধী সশস্ত্র অপারেশনঃ

অপারেশনের নাম	অপারেশনের এলাকা	সাল
বিটিএফ অপারেশন (Burma Territoria Force Operation)	উত্তর আরাকান	১৯৪৮
কমবাইন্ড ইমিগ্রেশন এণ্ড আর্মি (Combined Immigration & Army)	উত্তর আরাকান	১৯৫৫
ইউ,এম,পি, অপারেশন (Union Military Police Operation)	উত্তর আরাকান	১৯৫৫-৫৯
ক্যাপ্টেন টিন ক্যাইউ অপারেশন (Captain Htin Kyaw Operation)	বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা	১৯৫৯
শিউ কাই অপারেশন (Shwe Kyi Operation)	সমগ্র আরাকান	১৯৬৬
কাই গান অপারেশন (Kyi Gan Operation)	সমগ্র আরাকান	১৯৬৬
নাগাজিন কা অপারেশন (Nagazin Ka Operation)	সমগ্র আরাকান	১৯৬৭-৬৮
মাইয়াট মন অপারেশন (Myat Mon Operation)	সমগ্র আরাকান	১৯৬৯-৭১
মেজর অং থান অপারেশন (Major Aung Than Operation)	উত্তর আরাকান	১৯৭৩
সেব অপারেশন (Sabe Operation)	সমগ্র আরাকান	১৯৭৪
নাগামিন (ড্রাগন) অপারেশন (Nagamin (Dragon) Operation)	সমগ্র আরাকান	১৯৭৮

সারণিতে উল্লেখিত অপারেশনসমূহ বাহ্যিকভাবে রাষ্ট্রীয় শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার নামে পরিচালিত হ'লেও তা মূলতঃ রোহিঙ্গা উৎখাতেরই নীলনকশা। উল্লেখিত ১১টি অপারেশনের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল বিটিএফ, শিউ কাই, কাই গান, মেজর অং থান, সেব (Sabe) এবং ড্রাগন অপারেশন। এ অপারেশনসমূহ পরিচালনা করে সরকারি পরিকল্পনার ভিত্তিতে হাযার হাযার রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয় এবং লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করা হয়।

Nagamin Operation-এর পর ১৯৭৯ ও ১৯৯২ সালে আরো কয়েকটি মারাত্মক অপারেশন পরিচালনা করে লাখ লাখ রোহিঙ্গাকে ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তাদের অনেকেই স্বদেশে ফেরৎ গেলেও হাযার হাযার রোহিঙ্গা বাংলাদেশের উদ্বাস্তু শিবির কিংবা তার বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়ে বাংলাদেশেই থেকে যায়।[৫৮]

বার্মা সরকার ১৯৭৪ সালে BSPP-এর নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য First Peoples Congress (Pyethu Hlutn Taw) আহ্বান করে আরাকানকে শুধুমাত্র 'বৌদ্ধ শাসিত ষ্টেট' ঘোষণা করলে স্বৈরশাসকের ছত্রছায়ায় মগরা আরো উচ্ছৃংখল হয়ে ওঠে এবং আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিকল্পিতভাবে অনবরত রোহিঙ্গা মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা বাঁধিয়ে মুসলিম নিধন শুরু করে।[৫৯]

শুধু অপারেশন বা দাঙ্গা বাঁধানোই নয়, এছাড়াও বর্মী কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গা নির্মূলে আরো বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র রোহিঙ্গাদের কৃষি উৎপন্ন দ্রব্যাদির উপর ব্যাপকভাবে উচ্চ হারে করারোপ করে এবং আরোপিত কর পরিশোধ করতে না পারলে তাদের বসতবাড়ী ঘেরাও করে জীবিকার জন্য মজুদকৃত খাদ্য-শস্যাদি জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যায়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অজুহাতে অনেক অস্থাবর সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেই সাথে বর্মী সরকার ওয়াক্ফকৃত জমি ও সম্পত্তি বেআইনীভাবে ভিত্তিহীন অজুহাতে ছিনিয়ে নেয়। আরাকানে জনসংখ্যাগত অবস্থান পরিবর্তন এবং রোহিঙ্গাদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার জন্য তাদের বাজেয়াপ্তকৃত ভূমিতে নতুন নতুন মগ বসতি স্থাপন করে।[৬০]

রোহিঙ্গাদের জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের ক্ষেত্রে কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সরকারি অনুমতি ব্যতীত তারা এক থানা থেকে অন্য থানায় যেতে পারে না।[৬১] অপরদিকে বিনা মজুরীতে জবরদস্তিমূলক শ্রমের মাধ্যমে প্রতিদিন শত শত রোহিঙ্গা নারী, পুরুষ ও যুবকদেরকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারি ও নিরাপত্তা বাহিনীর কাজে দিনের পর দিন খাটানো হয়। শ্রমের মূল্য দাবী করলে কিংবা শ্রমদানে অস্বীকৃতি জানালে অমানবিক নির্যাতন অথবা মৃত্যুকেই সহজে মেনে নিতে হয়। রোহিঙ্গাদের উপর সেনাবাহিনী ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার জন্য নিয়মিত খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করা অনেকটা বাধ্যতামূলক।[৬২]

রোহিঙ্গাদের জীবন ও সম্পদই শুধু নয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহও বর্মী সরকারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। বুচিদং শহরের বাজার মসজিদ, রাহাস্ত্রী ও গাওয়ার প্রধান মসজিদ, আমবরী, আকিয়াব, কাইউক, নিমাই মসজিদ এবং বুচিদং শহরের টংবাজার দারুল উলূম মাদরাসাসহ বিপুল সংখ্যক মসজিদ-মাদরাসা বিধ্বস্ত ও উচ্ছেদ সাধন করা হয়। সেই সাথে ১৯৭৬ সালে কাইউক পাইউ শহরের মাদরাসাকে ভস্মীভূত করা হয়।[৬৩]

---

৫৮. Ibid.
৫৯. A History of Arakan, p. 155.
৬০. মুহম্মদ ইউনুছ, *অধিকৃত আরাকান জনগণ দেশ ও ইতিহাস (আরাকানঃ আর, এস, ও, ১৯৯০) পৃঃ ২৬-২৭।*
৬১. *New Straits Times, 11 November, 1992.*
৬২. *অধিকৃত আরাকান জনগণ দেশ ও ইতিহাস, পৃঃ ২৬-২৮।*
৬৩. *তদেব, পৃঃ ২৮-২৯; মুহাম্মদ আবুল হোসেন মাহমুদ, বার্মায় মুসলিম গণহত্যা (ঢাকাঃ বর্মী মুসলিম কেন্দ্রীয় সাহায্য কমিটি, ১৯৭৮), পৃঃ ৫০।*

হাদীছ সংকলনে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর অবদান

*আবু তাহের**

উপক্রমণিকাঃ

একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য ও সান্নিধ্য অর্জনের লক্ষ্যে যুগ যুগ ধরে কঠোর সাধনা ও পরিশ্রম এবং মহা আত্মত্যাগের বিনিময়ে যে সকল মহাপুরুষ চিরভাস্বর হয়ে আছেন, রেখে গেছেন মহান আদর্শ ও সমরকীর্তি, তাঁদেরই নির্ঘন্টে সোনার অক্ষরে লেখা একটি নাম আবুল হাফছ ওমর বিন আবদুল আযীয বিন মারওয়ান বিন হাকাম বিন আবিল আছ বিন উমাইয়া বিন ক্বারশী আল-উমারী।[১] তিনি ছিলেন একজন জলীলুল ক্বদর তাবেঈ[২] এবং ইসলামের ৫ম খলীফা।[৩] হাদীছ শাস্ত্রে তিনি অনন্য সাধারণ জ্ঞান ও বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। ৯৯ হিজরীর সফর মাসে তিনি খলীফা নিযুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই হাদীছ সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ সমূহকে সংকলন করার জন্য স্বীয় জীবন সোপর্দ করেছিলেন। নিম্নে হাদীছ সংকলনে তাঁর অবদান আলোচনা করা হ'লঃ

হাদীছ সংকলনের কারণঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে পবিত্র কুরআনের সাথে সংমিশ্রণের ভয়ে হাদীছ লিপিবদ্ধকরণ নিষিদ্ধ ছিল। তবুও কোন কোন ছাহাবী হাদীছ লিখে রাখতেন। তবে তা ব্যাপক কোন গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত ছিল না। যেমন আলী (রাঃ)-এর ছহীফা।[৪] সে যুগে হাদীছ সাধারণতঃ ছাহাবাগণের স্মৃতির ফলকে সংরক্ষিত ছিল। তাই ছাহাবাগণের ইন্তেকালের ফলে হাদীছ বিলুপ্ত হওয়ার আশংকায় ওমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) হাদীছ সংকলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

তিনি মদীনার শাসনকর্তা আবুবকর বিন মুহাম্মাদ বিন হাযম-এর প্রতি এ মর্মে ফরমান জারী করেন-

انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنته أوحديث عمر أو نحو هذا فاكتبه لى فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلماء-

'রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ, তাঁর সুন্নাত অথবা ওমর (রাঃ)-এর বাণী কিংবা অনুরূপ যা কিছু পাওয়া যায়, তার প্রতি দৃষ্টি দাও এবং আমার জন্য লিখে নাও। কেননা আমি ইলমে হাদীছের ধারকদের অন্তর্ধান ও হাদীছ সম্পদ বিলুপ্তির আশংকা করছি'।[৫]

হাদীছের প্রতি ওমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ)-এর গুরুত্ব ও সম্মানঃ

খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয হাদীছের প্রতি চরম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তিনি হাদীছের প্রতি আজ্ঞাবহ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আল্লামা যাহাবী যথার্থই বলেছেন,

كان فقيها مجتهدا عارفا بالسنن كبير الشأن ثبتا حجة حافظا قانتا لله اوّاها منيبا-

'তিনি ছিলেন ফক্বীহ, মুজতাহিদ, সুন্নাত ও হাদীছে বিশেষ পারদর্শী, বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন, লব্ধপ্রতিষ্ঠ হাদীছ অভিজ্ঞ, গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য হাদীছ বর্ণনাকারী, হাদীছের হাফেয, আল্লাহ্র বিধান পালনকারী, বিনয়ী ও আল্লাহভীরু'।[৬] তিনি তার অধীনস্ত সকলকে হাদীছের প্রতি আনুগত্য করার ফরমান জারী করেন। তিনি এক ভাষণে বলেন,

إنى اوصيك بتقوى الله واتباع سنة رسوله-

'আমি তোমাকে তাক্বওয়া অর্জনের এবং রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের আনুগত্যের নির্দেশ দিচ্ছি'।[৭]

তিনি একজন শাসনকর্তার নামে নিম্নোক্ত ভাষায় একটি নির্দেশনামা প্রেরণ করেনঃ

أما بعد فأمر أهل العلم أن ينشروا العلم فى مساجدهم فان السنة كانت قد أميتت-

'হাদীছবিদ ও বিদ্বান লোকদেরকে আদেশ করুন! তাঁরা যেন মসজিদে মসজিদে হাদীছের শিক্ষাদান ও তার ব্যাপক প্রচার করেন। কারণ হাদীছের ইলম প্রায় বিলীন হওয়ার উপক্রম হচ্ছে'।[৮]

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) হাদীছ-এর প্রতি এতই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় ফায়ছালার বিরুদ্ধে

---

* ২য় বর্ষ (অনার্স), আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, তারীখুল খুলাফা (দিল্লী ছাপা), পৃঃ ২২২।
২. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খৃঃ), পৃঃ ১৪২।
৩. তারীখুল খুলাফা, পৃঃ ২২২।
৪. বঙ্গানুবাদ সহীহ আল-বুখারী (ঢাকাঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০২।
৫. ঐ, ১/৯৫ পৃঃ।
৬. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খৃঃ), পৃঃ ৩১৫। গৃহীতঃ তাযকিরাতুল হুফফায ১/১০৬ পৃঃ।
৭. রাহমাতুল্লাহ আবদুল গণী, সিয়ার ওয়া আযকার ফী সীয়ারি ওয়া আছার (রিয়াদঃ প্রথম সংস্করণ, ১৪১৭ হিঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৯।
৮. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৪০৩। গৃহীতঃ সীরাতে ওমর বিন আবদুল আযীয, পৃঃ ৯৪।

হাদীছ পেলে ফায়ছালা প্রত্যাহার করতেন এবং হাদীছকে গ্রহণ করতেন। যেমন তাঁর খিলাফত কালে (৯৯-১০১ হিঃ) বিশ্বস্ত তাবেঈ মাখলাদ বিন খুফাফ আল-গিফারী একটি গোলাম খরীদ করেন ও তার জন্য খাদ্য ক্রয় করেন। তিনি বলেন যে, (কিছুদিনের মধ্যেই) তার কিছু (গোপন ও পুরাতন) দোষ আমার নিকটে প্রকাশিত হয়ে পড়ে (যা বিক্রেতা আমাকে বলেনি)। আমি তখন খলীফার দরবারে অভিযোগ দায়ের করলাম। তিনি আমাকে খাদ্যসহ উক্ত গোলাম ফেরত দানের ফায়ছালা দেন। অতঃপর আমি উরওয়া বিন যুবায়ের (২৩-৯৩ হিঃ)-এর নিকটে গেলাম ও তাঁকে সব খুলে বললাম। তিনি বললেন, আমি সন্ধ্যায় খলীফার নিকট যাব ও তাঁকে আয়েশা (রাঃ) (মৃঃ ৫৭ হিঃ) বর্ণিত রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ শুনাব যে, রাসূল (ছাঃ) এ ধরনের একটি ব্যাপারে যামানতের বিনিময়ে জরিমানা (الخراج بالضمان) আদায়ের নির্দেশ দান করেছিলেন। গিফারী বলেন, উরওয়ার একথা শুনে আমি নিজেই ওমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ)-এর নিকটে গেলাম ও উরওয়া বর্ণিত নবী (ছাঃ)-এর হাদীছ শুনালাম। ওমর (রহঃ) তখন বললেন, আমি যে ফায়ছালা দিয়েছিলাম তার চেয়ে এখন আমার জন্য ফায়ছালা কতই না সহজ হয়ে গেল। আল্লাহ জানেন আমি আমার ফায়ছালার মধ্যে 'হক্ব' ব্যতীত কিছুই আশা করিনি। এক্ষণে এ ব্যাপারে আমার নিকটে রাসূল (ছাঃ) হ'তে হাদীছ পৌঁছে গেছে। অতএব আমি আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করে রাসূল (ছাঃ)-এর ফায়ছালা জারী করলাম। এরপর উরওয়া (রাঃ) খলীফার নিকটে গেলেন এবং খলীফা আমাকে (ক্রয়মূল্য ফেরত নেওয়া ছাড়াও) খাদ্য দানের বিনিময় মূল্য গ্রহণের ফায়ছালা দান করলেন, যা ইতিপূর্বে বিক্রেতাকে প্রদানের জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৯]

তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে লিখিত অন্য এক ফরমানে বলেন, لا رأى لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم- '(তবে সাবধান) রাসূলের সুন্নাতের (হাদীছের) বিপরীতে কারো কোন রায় গৃহীত হবে না'।[১০]

হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনঃ

ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হ'ল হাদীছ। হাদীছ বিহীন ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার চিন্তা করা যায় না। তাই ওমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) খলীফা নিযুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের সংকল্প গ্রহণ করেন এবং এ মর্মে নিম্নোক্ত ভাষায় প্রাদেশিক গভর্ণরগণের নিকট ফরমান জারী করেন,

فانظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه-

'রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের প্রতি নযর দাও এবং তা সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ শুরু কর'।[১১]

মদীনার শাসনকর্তার প্রতি নির্দেশঃ

তিনি মদীনার শাসনকর্তা আবুবকর বিন মুহাম্মাদ বিন হাযম-এর প্রতি হাদীছ সংকলনের নির্দেশ জারী করেন। ফলে আবুবকর হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলন শুরু করেন। আল্লামা ইবনে সা'দ বলেন, আবুবকর বিন হাযমকে হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ ও তাঁর ক্রোড়ে লালিত-পালিত এবং তাঁর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত উমরা বর্ণিত হাদীছও লিখে পাঠাবার জন্য ফরমান প্রেরণ করেছিলেন।[১২] এই নির্দেশের ফলে আবুবকর বিন হাযম বিপুল পরিমাণ হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলন করেন। পরবর্তীতে এরই ভিত্তিতে সর্বত্র হাদীছের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে।

সালিম বিন আবদুল্লাহ্র প্রতি হাদীছ সংকলনের ফরমানঃ

খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) সালিম বিন আবদুল্লাহ্কে হাদীছ সংকলন করে তাঁর নিকট প্রেরণ করার ফরমান জারী করেন। এ মর্মে আল্লামা সুয়ূত্বী ইমাম যুহরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

كتب عمر بن عبد العزيز الى سالم بن عبد الله يكتب إليه بسيرة عمر بن الخطاب فى الصدقات-

'ওমর বিন আবদুল আযীয সালিম বিন আবদুল্লাহ্কে হযরত ওমরের যাকাত ও ছাদাক্বা সম্পর্কে অবলম্বিত রীতি-নীতি লিখে পাঠাবার জন্য আদেশ করেছিলেন।[১৩]

আল্লামা সুয়ূত্বী সালিম সম্পর্কে বলেন,

فكتب إليه بالذى سأل وكتب إليه إنك إن عملت بمثل عمر فى زمانه ورجاله فى مثل زمانك ورجالك كنت عند الله خيرا من عمر-

'সালিম যে সম্পর্কে আদিষ্ট হয়েছিলেন তা তিনি পুরোপুরি লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি তাঁকে এটাও লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, 'হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর আমলে ও তদানীন্তন লোকদের মধ্যে যেসব কাজ করেছিলেন,

৯. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ১৪২-১৪৩।
১০. ঐ, পৃঃ ১৪৩ ও ১৪৯। গৃহীতঃ ড. মুহাম্মাদ মুছতফা আযমী, দিরাসাত ফিল হাদীছি নববী ওয়া তারীখু তাদভীনিহি, পৃঃ ১৯; ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন ২/২৮২ পৃঃ।
১১. আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল কুদ্দুস, লোবাবুত তাওয়ারীখ (রহমানিয়া দারুত তাছনীফ, ১৯৬০ খৃঃ), পৃঃ ২০৭।
১২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, 'উমর বিন আবদুল আযীয' অধ্যায়।
১৩. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৩৯৯।

আপনিও যদি আপনার আমলে এখানকার লোকদের মধ্যে সেসব কাজ করেন, তবে আপনি আল্লাহ্র নিকট ওমর ফারূক (রাঃ) হ'তেও উত্তম ব্যক্তি বলে বিবেচিত ও পরিগণিত হবেন'।[১৪]

ইমাম যুহরীকে হাদীছ সংকলনের জন্য নিয়োগঃ

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) ইমাম যুহরীকে বিশেষভাবে হাদীছ সংকলনের জন্য নিয়োগ করেন। যুহরী নিজেই বলেন,

امرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا-

'ওমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) আমাদেরকে হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের জন্য আদেশ করেছিলেন। এই আদেশ পাওয়ার পর আমরা হাদীছের বিরাট বিরাট গ্রন্থ লিখে তার নিকট প্রেরণ করি। অতঃপর তিনি নিজেই তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রদেশে এক একখানি গ্রন্থ পাঠিয়ে দেন।[১৫] আল্লামা যুহরী যে এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারবেন তার প্রমাণ স্বরূপ ওমর বিন আবদুল আযীয নিজেই মন্তব্য করেন-

لم يبق احد اعلم بسنة ماضية من الزهرى-

'সুন্নাত ও হাদীছ সম্পর্কে যুহরী অপেক্ষা বড় আলিম আর একজনও জীবিত নেই'।[১৬] ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, 'সর্বপ্রথম যিনি হাদীছ সংকলন করেন তিনি হ'লেন যুহরী'।[১৭] আল্লামা যুহরী নিজেই এভাবে বলেন, 'আমার পূর্বে ইলমে হাদীছ আর কেউই সংকলন করেননি'।[১৮]

ছহীহ হাদীছ সংকলনের ফরমানঃ

বিচক্ষণ খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) যখন দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে মানুষ জাল হাদীছ রচনা করছে, তখন তিনি স্বীয় কর্মচারীদেরকে কেবলমাত্র যাচাই বাছাই করে একমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ তথা ছহীহ হাদীছ সংকলন করার কঠোর নির্দেশ জারী করেছিলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি এ মর্মে স্মারকলিপি প্রেরণ করেন যে,

ولايقبل إلا حديث النبى صلى الله عليه وسلم وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا-

'আর হাদীছে রাসূল ছাড়া যেন কিছু গ্রহণ করা না হয়। লোকেরা যেন এ ইলমে হাদীছকে ব্যাপকভাবে প্রচার করে। হাদীছ শিক্ষাদানের জন্য যেন মজলিস অনুষ্ঠিত হয়, যাতে যারা জানে না তারা যেন শিখে নিতে পারে। কেননা ইলম গোপন করা হ'লে তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়'।[১৯]

হাদীছ সংকলনে স্বয়ং ওমর বিন আবদুল আযীযঃ

নানা ব্যস্ততার মধ্যেও খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) স্বয়ং এ মহান খেদমতে জড়িয়ে পড়েন। আল্লামা আবু কালাবা এ প্রসঙ্গে চমৎকার উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছেন,

خرج علينا عمر بن عبد العزيز لصلاة الظهر ومعه قرطاس ثم خرج علينا لصلاة العصر وهو معه فقلت له يا أمير المؤمنين ما هذا الكتاب قال هذا حديث حدثنى به عون بن عبد الله فاعجبنى فكتبته فإذا فيه هذا الحديث-

'ওমর বিন আবদুল আযীয একদা যোহর ছালাতের জন্য মসজিদে আসলে আমরা তাঁর হাতে কিছু কাগজ দেখতে পেলাম। পরে আছরের ছালাতের জন্য বের হয়ে আসলেও তাঁর সঙ্গে সেই কাগজই দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে আমীরুল মুমেনীন! এই লিখিত জিনিসটি কি? উত্তরে তিনি বললেন, আওন ইবনে আবদুল্লাহ আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তা আমার খুব পসন্দ হয়েছে। তাই আমি তা লিখে নিয়েছি। তাতে এই হাদীছটিও রয়েছে'।[২০]

এভাবে ওমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) নিজে হাদীছ লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং রাষ্ট্রের সকল মুহাদ্দিছগণের হাদীছ সংকলনের নির্দেশনামা জারী করে হাদীছের অনেক গ্রন্থ সংকলন করেন। সংগত কারণেই এ মহান ব্যক্তিকে প্রথম শতকের ও ইসলামের প্রথম মুজাদ্দিদরূপে ভূষিত করা হয়েছে।[২১]

ওমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ)-এর তত্ত্বাবধানে সংকলিত হাদীছের গ্রন্থসমূহঃ

ওমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) হাদীছ সংকলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার পর বেশী দিন এ ধরণীতে বেঁচে ছিলেন না। তবে তাঁর এ আনজামের ফলে পরবর্তী বহু মনীষী এহেন গুরুত্বপূর্ণ কাজে জীবন কুরবান করে হাদীছের বড় বড় গ্রন্থ সংকলন করেছেন। আমরা নিম্নে খলীফার তত্ত্বাবধানে যে কয়টি গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল তা উপস্থাপন করছি।

---

১৪. ঐ। গৃহীতঃ তারীখুল খুলাফা, পৃঃ ৪১।
১৫. ঐ, পৃঃ ৪০১।
১৬. ঐ, পৃঃ ৪০১।
১৭-১৮. ঐ, পৃঃ ৪০২।
১৯. বঙ্গানুবাদ সহীহ আল-বুখারী ১/৯৬ পৃঃ।
২০. সুনানে দারেমী (মিসরী ছাপা), ১০৩ পৃঃ।
২১. ইবনে কাছীর, আল-বেদায়া ওয়ান-নেহায়া ৯/৯৪ পৃঃ।

১. ইমাম যুহরী সংকলিত গ্রন্থাবলীঃ

আল্লামা যুহরী বলেন, 'ওমর বিন আবদুল আযীয আমাদেরকে হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশে আমরা হাদীছের বিরাট বিরাট গ্রন্থ লিখে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিলাম। তারপর তিনি নিজেই তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রদেশে এক একখানি গ্রন্থ পাঠিয়ে দিলেন।২২

২. আবুবকর বিন হাযম-এর সংকলিত গ্রন্থঃ

মদীনার বিচারক আল্লামা আবুবকর বিন হাযম বহু হাদীছের গ্রন্থাবলী সংকলন করেন। কিন্তু তা খলীফার নিকট জমা দেওয়ার পূর্বেই খলীফা ইন্তেকাল করেন।

৩. সালিম বিন আবদুল্লাহ-এর রিসালাহঃ

সালিম বিন আবদুল্লাহ হযরত ওমরের যাকাত ও ছাদাক্বাহ সম্পর্কে রীতি-নীতি অবলম্বিত 'রিসালাহ' লিপিবদ্ধ করেন।

৪. ইমাম শা'বীর সুনানঃ

ইমাম শা'বী (রহঃ) তদানীন্তন কূফার কাযী ছিলেন। তিনি খলীফার আদেশ পেয়ে একই বিষয়ের হাদীছ সমূহ একই স্থলে সন্নিবদ্ধ করার কাজে সর্বপ্রথম হাত দেন। অবশ্য তিনি প্রথম অবস্থায় হাদীছ সংকলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। পরে খলীফার নির্দেশে বাধ্য হয়ে এ মহান কাজে জড়িয়ে পড়েন।

৫. ইমাম মাকহূল-এর সুনানঃ

আল্লামা মাকহূল (রহঃ) ওমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ)-এর কাযী ছিলেন। খলীফার আদেশে তিনি এ কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'কিতাবুস সুনান' নামক একটি গ্রন্থ সংকলন করেন।

৬. রুবাই বিন ছবাইহ ও সা'দ বিন আবী আরূবার গ্রন্থাবলীঃ

রুবাই বিন ছবাইহ ও সা'দ বিন আবী আরূবা হাদীছ সংকলনে এক অনন্য ভূমিকা রাখেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেন,

فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعد بن أبى عروبه وغيرهما فكانوا يصنفون كل باب على حدة-

'সর্বপ্রথম হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের কাজে অংশ নেন রুবাই বিন ছবাইহ ও সা'দ বিন আবী আরূবা এবং অন্যান্যরা। তাঁরা হাদীছের প্রত্যেকটি অধ্যায়কে স্বতন্ত্র্যভাবে গ্রন্থাবদ্ধ করতেন'।২৩

যবনিকাঃ

আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে আমরা বলতে পারি, ইসলামের ৫ম খলীফা হিসাবে পরিচিত ওমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল উমাইয়া খলীফাগণ হ'তে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ছিলেন। তিনি অসংখ্য প্রতিকূল অবস্থাকে অসম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করেছেন। প্রতিকূলতার আকাশ ছোঁয়া ঢেউয়ে যেখানে পূর্ববর্তী উমাইয়া খলীফাগণ তৃণখণ্ডের ন্যায় ভেসে গেছেন, সেখানেও তিনি দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় হক্বের উপর শির উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তাঁর অর্জিত জ্ঞান, সুন্দর জীবনের সকল রসসুধা বিন্দু বিন্দু করে জাতির উদ্দেশ্যে নিংড়িয়ে দিয়েছেন। জাতির মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তিনি জীবনের স্বার্থকতা অন্বেষণ করেছেন। হাদীছ সংকলন তাঁর জীবনের অনন্য অবদান। হাদীছ সংকলনের ফরমান জারী করার পর এ মহামানব বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। তিনি হাদীছ শাস্ত্রের অথৈ জলরাশির মধ্যে কিছু সংখ্যক নুড়ি কুড়িয়েছিলেন মাত্র এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত সকল হাদীছ বিজ্ঞানীগণকে ঐ সমুদ্রের গভীরে ডুব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ফলে তাঁর মৃত্যুর পর বহু হাদীছ বিজ্ঞানীগণ এ মহান কাজে জীবন সোপর্দ করে বহু বড় বড় হাদীছের কিতাব সংকলন করেছিলেন। তাই আজ আমরা ঘরে বসে বসে 'ক্বা-লাল্লাহু' ওয়া 'ক্বা-লা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)' পড়তে পারছি। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ। নতুবা হাদীছ দুশমনদের তীব্র স্রোতের ধারায় রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ খুঁজে পাওয়া যেত না। কিন্তু এরপরও হাদীছ শত্রুদের কালো থাবা হ'তে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ রেহাই পায়নি। ঐ সব সংকলিত হাদীছের গ্রন্থ সমূহের মধ্যে রয়েছে লক্ষ লক্ষ জাল ও যঈফ হাদীছ। তাই এ সন্ধিক্ষণে প্রয়োজন আজ ওমর বিন আবদুল আযীয-এর মত একজন রাষ্ট্রনায়ক যিনি দুনিয়ার সকল সংকলিত হাদীছের গ্রন্থ সমূহকে একত্রিত করে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে যোগ্য হাদীছ বিশেষজ্ঞদেরকে নিয়োগ করে জাল ও যঈফ হাদীছ সমূহ ছাটাই করে কেবলমাত্র ছহীহ হাদীছ সমূহ জাতিকে উপহার দিবেন। বাংলাদেশ সহ সমগ্র মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীদের প্রতি সেই প্রত্যাশাই রইল।

---

২২. আল্লামা যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায ১/১০৭ পৃঃ।

২৩. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৪০৫-৪০৬।

হাদীছ কি ও কেন?

*মুহাম্মাদ হারূন আযীযী নদভী**

সকল প্রশংসা নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক মানব জাতির শিক্ষক ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীগণের উপর।

মহান রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে মানব জাতির হেদায়াতের জন্য দু'টি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। **প্রথমঃ** 'কিতাবুল্লাহ' **দ্বিতীয়ঃ** 'রিজালুল্লাহ'। 'কিতাবুল্লাহ' অর্থাৎ আসমান থেকে অবতীর্ণ আল্লাহ পাকের মহাগ্রন্থ সমূহ। আর 'রিজালুল্লাহ' অর্থাৎ মানব জাতির পিতা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে মানুষের হেদায়াতের জন্য প্রেরিত নবী ও রাসূলগণ। আল্লাহ তা'আলা শুধু গ্রন্থ নাযিল করাই যেমন যথেষ্ট মনে করেননি, তেমনি শুধু রাসূল প্রেরণ করেও ক্ষান্ত হননি। বরং সর্বদা উভয় ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এতদুভয় ধারা সমভাবে প্রবর্তন করে আল্লাহ তা'আলা একটি বিরাট শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তা এই যে, মানুষের নির্ভুল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্যে শুধু গ্রন্থ কিংবা শুধু শিক্ষাই যথেষ্ট নয়; বরং একদিকে আল্লাহ্র হেদায়াত ও আল্লাহ্র সংবিধানেরও প্রয়োজন, যাকে কুরআন বলা হয় এবং অপরদিকে একজন শিক্ষাগুরুরও প্রয়োজন, যিনি স্বীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে আল্লাহ্র হেদায়াতে অভ্যস্ত করে তুলবেন। কারণ মানুষই মানুষের প্রকৃত শিক্ষাগুরু হ'তে পারে। গ্রন্থ কখনও গুরু বা অভিভাবক হ'তে পারে না, তবে শিক্ষা-দীক্ষায় সহায়ক অবশ্যই হ'তে পারে।

ইসলামের সূচনা একটি গ্রন্থ ও একজন রাসূলের মাধ্যমে হয়েছে। এ দু'য়ের সম্মিলিত শক্তিই জগতে একটি সুষ্ঠু ও উচ্চ স্তরের আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনিভাবে ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যেও একদিকে পবিত্র শরী'আত এবং অন্যদিকে কৃতী পুরুষগণ রয়েছেন। কেউ কেউ কুরআনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে শুধু ওলামা ও মাশায়েখকেই সবকিছু মনে করে বসে। তারা শরী'আতের অনুসারী কি-না তারও খোঁজ নেয় না। এ রোগটি আসলে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের থেকেই সংক্রামিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে তাদের ওলামা ও মাশায়েখকে স্বীয় উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে' *(তওবাহ ৩১)*।

রাসূলগণের মহান দায়িত্ব ছিল আল্লাহ তা'আলার কিতাবের মর্মবাণী ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মানুষকে বলে দেয়া এবং আল্লাহ্র কিতাব মতে কিভাবে আমল করা যায় তার একটি বাস্তব নমুনা ও আদর্শ জনগণের সামনে পেশ করা। রিসালাত ও নবুওয়াতের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। মানব ইতিহাসের সূচনা লগ্ন থেকেই এর প্রারম্ভ। সর্বপ্রথম নবী ছিলেন হযরত আদম (আঃ)। আর সর্বশেষ নবী হ'লেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। রাসূল হিসাবে তাঁর দায়িত্ব ছিল অনেক, কুরআন মাজীদে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষায় তা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। বস্তুতঃ তারা ছিল পূর্ব থেকে পথভ্রষ্ট' *(আলে ইমরান ১৬৪)*। এই একই কথাগুলি সূরা বাক্বারাহ্র ১২৯, ১৫১ এবং সূরা জুম'আহ্র ২ আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে। এই আয়াতগুলিতে রিসালাতের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। **প্রথমঃ** কুরআন তেলাওয়াত করে শুনানো, **দ্বিতীয়ঃ** কুরআন ও সুন্নাহ্র শিক্ষা দান। **তৃতীয়ঃ** পবিত্রকরণ। অর্থাৎ বাহ্যিক ও আত্মিক নাপাকী থেকে পবিত্র করা। উক্ত আয়াতগুলিতে 'হেকমত' শব্দের অর্থ হ'ল 'সুন্নাহ' *(তাফসীরে ইবনে কাছীর)*।

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেখানে ছিলেন কুরআন তেলাওয়াতকারী ও আত্মশুদ্ধিকারক সেখানে তিনি একজন কুরআন-সুন্নাহ্র আদর্শ শিক্ষকও ছিলেন। এছাড়া তাঁকে আদর্শ নমুনা ও অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবেও প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে অনুপম আদর্শ রয়েছে' *(আহযাব ২১)*। অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'বলুন! যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তাহ'লে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের পাপ সমূহ মার্জনা করে দেন। আল্লাহ হ'লেন ক্ষমাকারী দয়ালু' *(আলে ইমরান ৩১)*। এমনিভাবে তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক হিসাবে। এরশাদ হয়েছেঃ 'নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফায়ছালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান' *(নিসা ১০৫)*। অন্যত্র এরশাদ হয়েছেঃ 'অতএব তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে' *(নিসা ৬৫)*। এমনিভাবে আল্লাহ পাক তাঁকে পাঠিয়েছেন হালাল-হারামকারী হিসাবে। এরশাদ হয়েছেঃ 'তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে, তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তু সমূহ' *(আ'রাফ ১৫৭)*। এমনিভাবে তাঁকে তাবলীগে রিসালাতের দায়িত্ব দিয়েও পেরণ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ 'হে রাসূল! পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন তবে

* খত্বীব, আলী মসজিদ, বাহরাইন, ফোন- ৬৯৫৯৭৮।

আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না' *(মায়েদাহ ৬৭)*।

এমনিভাবে আল্লাহ্‌র মুরাদ বর্ণনাকারী হিসাবেও প্রেরণ করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ 'এই কুরআন আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়গুলিকে আপনি স্পষ্ট করে বর্ণনা করে দেন' *(নাহ্‌ল ৪৩)*। এছাড়া এরূপ আরো অনেক গুণ-মর্যাদা এবং দায়িত্ব ও কার্যভার সহ তিনি প্রেরিত হয়েছেন। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সমূহ দায়িত্ব আদায় করতঃ এবং তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত সমূহ গুণের ব্যবহার করতঃ নবী-রাসূল, দাঈ ও মুবাল্লিগ, মু'আল্লিম ও মুরুব্বী, ন্যায়নিষ্ঠ শাসক ও বিচারক, আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার, আত্মশুদ্ধিকারক ও আধ্যাত্মিক গুরু, কুরআনের ব্যাখ্যাকার ও আল্লাহ্‌র মুরাদ বর্ণনাকারী এবং পরস্পরের বিবাদ মীমাংসাকারী ও হালাল-হারাম নির্ণয়কারী হিসাবে যা বলেছেন, যা করেছেন এবং অনুমোদন ও সমর্থন করেছেন সেই সব কথা, কাজ, সমর্থন ও অনুমোদনকেই বলা হয় 'হাদীছ'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাউলী, ফে'লী ও তাকরীরী তিন প্রকারের হাদীছই মূলতঃ শরী'আতের দ্বিতীয় মহান দলীল বা উৎস।

'হাদীছ' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ নতুন, কথা ও খবর। এটি 'ক্বাদীম' (পুরাতন)-এর বিপরীত অর্থবোধক শব্দ (তাজুল আরূস)। মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় হাদীছ বলতে বুঝায়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যাবতীয় কথা, কাজ, অনুমোদন, সমর্থন ও তাঁর অবস্থার বিবরণকে। আল্লামা জা'ফর আহমাদ ওছমানী বলেন, 'যা কিছু রাসূল (ছাঃ)-এর নামে বর্ণিত আছে তার সমুদয়কে হাদীছ বলা হয়'।[১] ডক্টর মাহমূদ ত্বাহ্‌হান বলেন, 'রাসূলের নামে কথিত কথা, কাজ, অনুমোদন ও গুণ-বৈশিষ্ট্যকে হাদীছ বলা হয়' *(তায়সীরু মুছ্‌তালাহিল হাদীছ)*। আল্লামা তীবী, হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, নবাব ছিদ্দীক্ব হাসান খাঁন ও ইমাম সাখাবী বলেন, 'হাদীছের অর্থ ব্যাপক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে যেমন হাদীছ বলা হয়, তেমনি ছাহাবী, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের কথা, কাজ ও অনুমোদনকেও হাদীছ বলা হয়'।[২]

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বিবরণে নবী করীম (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের কথা, কাজ ও সমর্থন যদিও মোটামুটি ভাবে হাদীছ নামে অভিহিত, তথাপি শরী'আতী মর্যাদার দৃষ্টিতে এসবের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। তাই হাদীছ শাস্ত্রে প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্র পরিভাষা নির্ধারণ করা হয়েছে। যথাঃ নবী করীম (ছাঃ)-এর কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'হাদীছ'। ছাহাবীগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'আছার' এবং তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'ফাতাওয়া'। এছাড়া তিন প্রকারের হাদীছের আরো তিনটি পারিভাষিক নাম রয়েছে। যথাঃ নবী করীম (ছাঃ)-এর কথা, কাজ ও সমর্থন সংক্রান্ত বিবরণকে বলা হয় 'মারফূ' হাদীছ। ছাহাবীগণের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় 'মাওকূফ' হাদীছ এবং তাবেঈগণের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় 'মাক্বতূ' হাদীছ।[৩]

'হাদীছের অপর নাম 'সুন্নাহ'। 'সুন্নাহ' শব্দের অর্থ চলার পথ, পদ্ধতি ও কর্মনীতি। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী বলেন, 'সুন্নাতুন্নবী বলতে সে পথ ও রীতি পদ্ধতিকে বুঝায়, যা নবী করীম (ছাঃ) বাছাই করে নিতেন এবং অবলম্বন করতেন।[৪] মুহাদ্দিছগণ 'হাদীছ' ও 'সুন্নাহ'কে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন।[৫]

শায়খ ডক্টর মোস্তফা সাবায়ী বলেন, 'আরবী অভিধানে 'সুন্নাহ' অর্থ কর্মপন্থা, কর্মপদ্ধতি- তা ভাল বা মন্দ যাই হোক। মুসলিম শরীফের হাদীছ দ্বারাও তা বুঝা যায়।

পক্ষান্তরে পরিভাষায় 'সুন্নাহ'-এর একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমনঃ (১) হাদীছ শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও সম্মতি এবং তাঁর শারিরীক বৈশিষ্ট্য, স্বভাব-চরিত্রকে 'সুন্নাহ' বলা হয়। তা নুবুওয়াত লাভের আগের হোক বা পরের, (২) উছূল শাস্ত্রবিদগণের মতে 'সুন্নাহ' বলা হয়- প্রত্যেক ঐ সকল কথা, কর্ম ও সম্মতিকে, যা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সম্পৃক্ত এবং যার থেকে শরী'আতের কোন না কোন হুকুম প্রমাণিত হয়, (৩) ফিক্বাহ শাস্ত্রবিদগণের মতে 'সুন্নাহ' হ'ল, ফরয-ওয়াজিব ব্যতীত শরী'আতের অন্যান্য হুকুম-আহকাম, (৪) মুহাদ্দিছগণের মতে এবং অনেক সময় ফিক্বহ্‌ শাস্ত্রবিদগণের মতেও 'সুন্নাহ' বলা হয় ঐ সব কর্মকে, যা শরী'আতের কোন দলীল কিংবা উছূলে শরী'আতের কোন আছল দ্বারা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রমাণিত।[৬]

এছাড়া আরো দু'টি শব্দ কখনো হাদীছ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা হ'ল 'খবর' ও 'আছার'। কিন্তু বেশী প্রসিদ্ধ শব্দ হ'ল 'হাদীছ' ও 'সুন্নাহ'। হাদীছ বর্ণনাকারীদের নিজস্ব গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে হাদীছ বিভক্ত হয়। যথাঃ ছহীহ, হাসান, যঈফ, মওযূ ইত্যাদি। যে হাদীছ ধারাবাহিকভাবে সঠিক সংরক্ষণ দ্বারা নির্ভরযোগ্য সনদে (সূত্রে) বর্ণিত আছে এবং যাতে বিরল ও ত্রুটিযুক্ত বর্ণনাকারী থাকে না তাকে **'ছহীহ'** বলা হয়। আর হাদীছে ছহীহের উল্লেখিত গুণাবলী বর্তমান থাকার পর যদি বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল প্রমাণিত হয়, সেই হাদীছকে **'হাদীছে হাসান'** বলা হয়। যে হাদীছে ছহীহ ও হাসান হাদীছের শর্ত সমূহ পাওয়া যায় না তাকে 'হাদীছে যঈফ' বলে। আর যে মিথ্যা ও বানোয়াট বিষয় রাসূল পাক (ছাঃ)-এর দিকে সম্বন্ধিত করা হয়, তাকে **'হাদীছে মওযূ'** বা জাল হাদীছ বলে। এ ছিল হাদীছের সংক্ষিপ্ত পারিভাষিক

---

১. *কাওয়ায়িদ ফী উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ১৯।*
২. *তাওযীহুন্নযর, পৃঃ ৯৩, আল-হিত্তাহ পৃঃ ২৪; ফাতহুল মুগীছ, পৃঃ ১২।*
৩. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, হাদয়ুস সারী, পৃঃ ২৮।*
৪. *মুফরাদাত, পৃঃ ২৪৫।*
৫. *কাশফুল আসরার ২/২, তাওযীহুন্নযর, পৃঃ ৩।*
৬. *আস্‌-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ১/৪৭ পৃঃ; আল-ওয়াযউ ফিল হাদীছ ১/৩৭, ৪০।*

আলোচনা। এবার আসুন ইসলামে হাদীছে রাসূলের মর্যাদা সম্পর্কে একটু অবগত হই। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম দেখতে হবে কুরআন কি বলে? কুরআন অধ্যয়ন করলে আমরা বুঝতে পারি যে, অন্ততঃ শতাধিক আয়াত একথা প্রমাণ করে যে, হাদীছে রাসূলও কুরআন মাজীদের ন্যায় শরী'আতের উৎস। কুরআনের পরেই তার স্থান। হাদীছও কুরআনের মত 'অহি'। কুরআন বুঝার জন্য হাদীছের প্রয়োজন। হাদীছকে অস্বীকার করলে কুরআনকে অস্বীকার করা হবে এবং সে ব্যক্তি ধর্মচ্যুত ও ইসলাম বহির্ভূত হবে। হাদীছ বাদ দিয়ে কুরআন মানার কোন অবকাশ নেই। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি আয়াত তুলে ধরছিঃ

১. আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'নক্ষত্রের কসম, যখন তা অস্তমিত হয়। তোমাদের সংগী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। তা তো 'অহি' (নাজম ১, ২, ৩, ৪)। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের পক্ষ থেকে কথা তৈরী করে আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেন না। এর কোন সম্ভাবনাই নেই। বরং তিনি যা কিছু বলেন, তা সবই আল্লাহ্র কাছ থেকে প্রত্যাদেশ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিভিন্ন উপায়ে যে 'অহি' নাযিল হ'ত, তা সাধারণতঃ দুই প্রকার। প্রথম 'অহিয়ে মাতলু' অর্থাৎ যার অর্থ ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ্র কাছ থেকে নাযিল হয়। এর নাম 'আল-কুরআন'। দ্বিতীয় 'অহিয়ে গায়রে মাতলু' অর্থাৎ যার অর্থ কেবল আল্লাহ্র তরফ থেকে নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই অর্থ নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন। এর নাম 'হাদীছ' ও 'সুন্নাহ'।

এরপর হাদীছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে বিষয়বস্তু বিধৃত হয়, কখনও তা কোন ব্যাপারে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ফায়ছালা তথা বিধান হয়ে থাকে এবং কখনও কেবল সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়। এই নীতির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইজতিহাদ করে বিধানাবলী বের করেন। এই ইজতিহাদে ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তথা পয়গম্বরকুলের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁদের ইজতিহাদে ভুল খুব কমই হয়ে থাকে। আর কখনো ভুল হয়ে গেলে আল্লাহ পাক তাঁদেরকে ভুলের উপর স্থির ও প্রতিষ্ঠিত রাখেন না। বরং সাথে সাথে অহি-র মাধ্যমে শুধরিয়ে দেন। কিন্তু অন্যান্য মুজতাহিদ আলেম ইজতিহাদে ভুল করলে তারা তার উপর ক্বায়েম থাকতে পারেন। এজন্যই যখনই কোন মুজতাহিদ ইমামের ইজতিহাদের বিপরীত কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যাবে, তখন হাদীছ বাদ দিয়ে ইজতিহাদ মতে আমল করার কোন অবকাশ থাকে না। এ কারণেই সকল মুজতাহিদ ইমামগণ সুস্পষ্ট ভাষায় এ কথা স্বীকার করেছেন যে, ছহীহ হাদীছই আমাদের মাযহাব। আর যখনই আমাদের কথার বিপরীত কোন হাদীছ পাবে তখন আমাদের কথা বাদ দিয়ে হাদীছ অনুসারে আমল করতে হবে। তবে ইমামগণের এই ভুল আল্লাহ্র কাছে কেবল ক্ষমাই নয়; বরং ধর্মীয় বিধান হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষেত্রে তাঁরা যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, তজ্জন্যে তাঁরা কিঞ্চিৎ ছওয়াবেরও অধিকারী হবেন।

২. আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা' *(হাশর ৭)*।

এই আয়াতটি ফায়-এর মাল বন্টন সম্পর্কে অবতীর্ণ হ'লেও আয়াতের ভাষা ধন-সম্পদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্ক যুক্ত নয়; বরং শরী'আতের বিধি-বিধানও এতে দাখিল আছে। তাই ব্যাপক ভঙ্গিতে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যে কোন নির্দেশ অথবা ধন-সম্পদ অথবা অন্য কোন বস্তু তিনি কাউকে দেন, তা তার গ্রহণ করা উচিত এবং তদনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে তিনি যে বিষয়ে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকা দরকার। অনেক ছাহাবায়ে কেরাম আয়াতের এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রত্যেক নির্দেশকে কুরআনের নির্দেশের স্বরূপ অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন ঐসব নারীর উপর, যারা অন্যের শরীরে নাম বা চিত্র অংকন করে এবং যারা নিজ শরীরে অন্যের দ্বারা অংকন করায়, যারা ললাট বা কপালের উপরস্থ চুল উপড়িয়ে কপাল প্রশস্ত করে এবং সৌন্দর্যের জন্য রেত ইত্যাদির সাহায্যে দাঁত সরু ও দু'দাতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে। এ সব নারী আল্লাহ্র সৃষ্টির আকৃতি বিকৃত করে ফেলে'। বনী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকুব নামীয় এক মহিলা এই বর্ণনা শুনে ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর নিকট আসল এবং বলল, আমি জানতে পেরেছি যে আপনি এ ব্যাপারে লা'নত করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যার উপর লা'নত করেছেন, আল্লাহ্র কিতাবে যার প্রতি লা'নত করা হয়েছে, তার উপর আমি লা'নত করব না কেন? তখন মহিলাটি বলল, আমি তো কুরআন শরীফ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি, তাতে তো আপনি যা বলেছেন তা পেলাম না, আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, যদি তুমি পড়তে তবে অবশ্যই পেতে। তুমি কি পড়নিঃ 'রাসূল তোমাদেরকে যা নির্দেশ দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে বারণ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহ্কে ভয় করে চলো। মহিলাটি বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বললেন, রাসূল (ছাঃ)ও তা থেকে নিষেধ করেছেন।[৭]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) একবার মক্কা শরীফে ঘোষণা করলেন, আমি তোমাদের প্রত্যেক প্রশ্নের জওয়াব কুরআন থেকে দিতে পারি। জিজ্ঞেস কর, যা জিজ্ঞেস করতে চাও। জনৈক ব্যক্তি আরয করল, এক ব্যক্তি এহরাম অবস্থায় প্রজাপতি মেরে ফেলল, এর বিধান কি? ইমাম শাফেঈ

৭. *ছহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, সূরা আল্ হাশর, ৪/৫৬২ পৃঃ, হা/৪৫১৮।*

(রহঃ) উক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করে হাদীছ থেকে এর বিধান বর্ণনা করে দিলেন।[৮]

৩. আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ 'হে মুমিনগণ! আল্লাহ্র নির্দেশ মান্য কর, রাসূলের নির্দেশ মান্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের নির্দেশ মান্য কর। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহ'লে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যার্পণ কর। যদি তোমরা আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম' *(নিসা ৫৯)*।

উক্ত আয়াতে 'উলুল আম্র' এর অর্থ কেউ বলেছেন শাসক বর্গ আর কেউ বলেছেন উলামা ও ফিক্বহবিদগণ। উভয় অর্থ আয়াতে হ'তে পারে। উদ্দেশ্য হ'ল, আসল 'এতা'আত' তো আল্লাহ্রই। কারণ সৃষ্টি যেহেতু তাঁর, 'হুকুম'ও তাঁরই হবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেহেতু আল্লাহ্র বিশ্বস্ত প্রতিনিধি এবং নির্ভেজাল ভাবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্য ও মুরাদ বর্ণনাকারী, সেহেতু আল্লাহ তা'আলা নিজের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর হুকুমকেও স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, কুরআনের মত হাদীছে রাসূলও দ্বীনে ইসলামের একটি উৎস। আল্লামা ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র আনুগত্যের অর্থ হ'ল কিতাবুল্লাহ (কুরআন)-কে মান্য করা। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্যের অর্থ হ'ল হাদীছে রাসূলের অনুসরণ। আর 'উলুল আম্র' তথা শাসকবর্গ ও ওলামা-ফুক্বাহার আনুগত্যের অর্থ হ'ল তারা যদি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের সাথে কোন আদেশ নিষেধ করে তা মানতে হবে। আর যদি আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর বিপরীত কোন আদেশ-নিষেধ করে তা কখনো মান্য করা যাবে না।[৯] বুঝা গেল যে, 'উলুল আমরে'র আনুগত্যের স্বতন্ত্র কোন মর্যাদা নেই। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের অধীন। এই কারণেই 'আতীউল্লাহ' এরপর 'আত্বীউর রাসূল' তো বলা হয়েছে কিন্তু 'আত্বীউ উলিল আম্র' বলা হয়নি; তদ্রূপ সাধারণ লোকজন ও উলুল আমরের মধ্যে বিরোধ কালে উলুল আমরের হুকুমকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি; বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের প্রতি অর্থাৎ কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দিকে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। এই আয়াত দ্বারা আরো বুঝা গেল যে, উম্মতের যে কোন মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই ফায়ছালা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় প্রকৃত ঈমানদার হ'তে পারবে না।

৪. আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন, আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও হেকমত এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না' *(বাক্বারাহ ১৫১)*।

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চারটি দায়িত্বের কথা বলেছেন। প্রথম তিলাওয়াতে কুরআন, দ্বিতীয় তাযকিয়া, তৃতীয় তা'লীমে কিতাব, চতুর্থ তা'লীমে হেকমত। এখানে হেকমতের অর্থ হ'ল সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ)। ইমাম শাফেঈ, হাফেয ইবনু কাছীর, আল্লামা বায়যাভী, ইমাম ত্বাবারী, রবী, যামাখশারী, ইমাম রাযী, কাতাদা ও আরো অনেকে হেকমতের অর্থ বলেছেন 'সুন্নাহ'।[১০] এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হাদীছে রাসূলও শরী'আতের দলীল এবং তার গুরুত্ব অপরিসীম।

৫. আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন কোন ক্ষমতা নেই, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়' *(আহযাব ৩৬)*।

এই আয়াতে বলা হ'ল যে, যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কারো প্রতি বাধ্যতামূলকভাবে কোন কাজের নির্দেশ দান করেন, তবে সে কাজ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। শরী'আত অনুযায়ী তা না করার অধিকার থাকে না। যে লোক এ কাজ পালন করবে না, আয়াতের শেষে তাকে স্পষ্ট গোমরাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'আয়াতটি সকল ব্যাপারে স্বতন্ত্র অর্থাৎ যেকোন ব্যাপারে যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আদেশ দেন তখন সেখানে কোন বিরোধিতা চলবে না, কারো কোন অধিকার থাকবে না এবং কোন রায় ও অভিমতও গ্রহণ করা হবে না।[১১] বুঝা গেল যে, এই আয়াতটিও 'হাদীছ' শরী'আতের দলীল হওয়ার আর একটি প্রমাণ।

৬. আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'বলুন! যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তাহ'লে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হ'লেন ক্ষমাকারী দয়ালু' *(আলে ইমরান ৩১)*।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ভালবাসার মাপকাঠি বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ। আর এই অনুসরণকে স্বতন্ত্র রাখা হয়েছে কোন বিশেষণ তা এখানে আনা হয়নি। অতএব কুরআন ভিত্তিক অনুসরণ ও সুন্নাহ ভিত্তিক অনুসরণ উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। তাহ'লে বুঝা গেল যে, কুরআনের মত হাদীছও শরী'আতের এক অনুসরণীয় দলীল।

৭. আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতএব আপনার পালনকর্তার শপথ! সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে

৮. *সুয়ূতী, আল্-ইত্ক্বান ২/১২৬।*
৯. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা নিসা, পৃঃ ৪৩৯।*
১০. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/১৮৪; দুররে মানছূর ১/১৮৯; তাফসীরে কাবীর ২/৫০; তাফসীরে ত্বাবারী ৪/১০৮।*
১১. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, পৃঃ ১৩৬৯।*

মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা স্থান পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে' *(নিসা ৬৫)*।

এই আয়াতটিও হাদীছ শরী'আতের দলীল হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। কারণ এতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যে কোন সিদ্ধান্তকে যতক্ষণ নির্দ্বিধায় ও নিঃসঙ্কোচে মেনে নিতে না পারবে, ততক্ষণ মুমিন হ'তে পারবে না।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, এখানে যে মীমাংসার কথা বলা হয়েছে তা কুরআনের স্পষ্ট হুকুম নয়; বরং তা হ'ল 'সুন্নাহ'।[১২] অতএব এই আয়াত দ্বারা 'সুন্নাহ'র অপরিহার্যতা ও আবশ্যকীয়তা বুঝে আসে এমনভাবে যে, তার উপর দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল না হ'লে সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) বলেন, 'কুরআনের বাণী সমূহের উপর আমল করা মহানবী (ছাঃ)-এর যুগের সাথেই সীমিত নয়। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর পবিত্র শরী'আতের মীমাংসাই হ'ল তাঁর মীমাংসা। কাজেই এ নির্দেশটি ক্বিয়ামত পর্যন্ত তেমনিভাবে বলবৎ থাকবে, যেমন ছিল তাঁর যুগে। তখন যেমন সরাসরি কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তকল্পে তাঁর কাছে উপস্থিত করা হ'ত, তেমনি তাঁর পরে তাঁর শরী'আত (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ)-এর মীমাংসা নিতে হবে। আর এটা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই অনুসরণ।

এই আয়াত দ্বারা এই বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, 'ফীমা শাজারা বাইনাহুম' বাক্যটি শুধু আচার-অনুষ্ঠান কিংবা অধিকারের সাথেই সম্পৃক্ত নয়, আক্বীদা, মতবাদ এবং অপরাপর বৈষয়িক বিষয়েও ব্যাপক। অতএব কোন সময় কোন বিষয়ে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিলে বিবাদ পরিহার করে উভয় পক্ষকে রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর নিকট এবং তাঁর অবর্তমানে তৎপ্রবর্তিত শরী'আতের আশ্রয়ে গিয়ে মীমাংসা অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয।[১৩]

[চলবে]

১২. *ইমাম শাফেঈ, আর-রিসালা, পৃঃ ৮৩।*
১৩. *তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন, পৃঃ ২৬১, ২৬২।*

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

অতীন্দ্রিয় যে জগৎ অপেক্ষা করছে

*মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বাইরে যে অদৃশ্য জগৎ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে এবং প্রতিনিয়ত যে আবাসস্থলের দিকে আমরা অগ্রসর হচ্ছি অনেক লোকই তা নিয়ে মোটেও ভাবনা-চিন্তা করে না। তারা তাদের দুনিয়া ও বর্তমানকে নিয়ে মেতে আছে, যেন সামনে আগত অতীন্দ্রিয় জগৎ কোনই গুরুত্বের বিষয় নয়। অথচ উচিত ছিল তাকেই পুরোপুরি গুরুত্ব দেওয়া। কেননা সেটাই ভবিষ্যত বা প্রকৃত ও শাশ্বত জীবন। এ জীবন অদৃশ্য ও ইন্দ্রিয়াদির ধরা-ছোঁয়ার বাইরে বলেই কি তারা এর বাস্তবতা নিয়ে সন্দিহান? না কি, দুনিয়া তাদেরকে এ জগত সম্পর্কে নির্লিপ্ত ও উদাসীন করে দিয়েছে? যদি প্রথম কথাটি সঠিক হয় তাহ'লে তাদের ঈমান দুহরান উচিত। আর যদি দ্বিতীয় কারণ সঠিক হয় তাহ'লে সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তাদের হুঁশিয়ার হওয়া দরকার। অদৃশ্যলোক ও আখেরাতে বিশ্বাস তো ঈমানের অপরিহার্য শর্ত। এ সম্পর্কে সুদৃঢ় ঈমান না রেখে কি করে থাকা যায়; যেখানে আল্লাহ তা'আলা কসম করে বলেছেন, 'আকাশ ও যমীনের প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয়ই তোমরা যে কথা বল, তা যেমন সত্য ও বাস্তব তেমনি উহাও (ক্বিয়ামত) অবশ্যই সত্য ও বাস্তব' *(যারিয়াত ৩৩)*। উদাসীনতা এবং দুনিয়া ও তার ঐশ্বর্যপ্রীতি আমাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছে। আখেরাতকে নিয়ে ভাববার অবকাশ আমাদের আজ মোটেও নেই।

আমরা যদি যাবতীয় গাফলতী কাটিয়ে উঠতে পারতাম এবং এই অদৃশ্য জগৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারতাম তাহ'লে কতইনা ভাল হত! আমরা যদি এমনটি ভাবতে পারতাম, যেন আমরা সেই জগতে বিচরণ করছি, সেখানেই বসবাস করছি, যেমনভাবে কুরআন ও সুন্নাহ তার ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছে, তাহ'লে এই ভাবনা অদৃশ্য জগতের প্রকৃত ধারণা জন্মাতে সক্ষম হ'ত এবং তা এই অদৃশ্য জগতের মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণে উৎসাহিত করত ও এ আবাসে এসে যাতে সুখ-ঐশ্বর্য লাভ হয় তজ্জন্য সৎ কাজ করতে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করত।

এ অদৃশ্য জগৎ বা গায়েব তো পরবর্তী মুহূর্ত থেকেই শুরু। যদি আমরা তাকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করতে চাই তাহ'লে প্রথম পর্যায় হবে পরবর্তী মুহূর্ত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, তারপর মৃত্যু, তারপর কবর ও বারযাখের জীবন, তারপর পুনরুত্থান, তারপর আল্লাহপাকের সামনে হাযির, হিসাব ও পুলসিরাত পার, তারপর জান্নাত কিংবা জাহান্নাম।

আমাদের অবশিষ্ট আয়ুষ্কালঃ

আমাদের যে আয়ুটুকু বাকী আছে আমরা জানি না যে, তা

* *সহকারী শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চবিদ্যালয়।*

দীর্ঘায়িত হবে, না সংক্ষিপ্ত হবে। আমরা কি এ সময়ের মধ্যে ভাল ও সৎকর্ম করতে সক্ষম হব, নাকি ফিতনা, বক্রতা ও বিভ্রান্তির শিকার হব? বিশেষ করে বর্তমান যুগে যেখানে নানা রকমের অসংখ্য ফিতনা দেখা দিয়েছে এবং ভয় ও সতর্কতার অনুভূতির সাথে লোভ ও আল্লাহ্র রহমতের আশার অনুভূতি বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমাদের অবশ্য কর্তব্য আল্লাহ্র ভয় ও তার রহমতের আশার মাধ্যমে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা, যা আমাদের মধ্যে পরজগতে উপকারী যাবতীয় পুণ্য কাজে অংশগ্রহণের মত অমিততেজ শক্তি সৃষ্টি করতে পারে।

হে ভ্রাত! আমাদের চিন্তার যে সূত্র সে মুতাবেক আসুন আমরা একটু বসি। নিজের মনকে অন্য সব চিন্তা মুক্ত করুণ এবং নিজেকে নিয়ে একটু চিন্তা করুন; অবশ্য নিজেকে নিয়ে বিব্রত বোধ করলে অন্য এমন কাউকে ভাবুন যাকে ডাক্তারগণ এমন রোগে আক্রান্ত বলে সার্টিফাই করেছেন, যে ছয় মাসের মধ্যেই পরপারে যাত্রা করবে, এর বেশী বাঁচবে না। তার এ আয়ুর কথা সেও জেনে ফেলেছে। এখন তার মনের অবস্থা কি হ'তে পারে একটু চিন্তা করুন। ধরে নিন, সে একজন ঈমানদার। নিঃসন্দেহে সে যথাসাধ্য দ্রুত সব সৎ কাজ করে যাবে। তার প্রতিটি মুহূর্তকে সে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করবে এবং আখেরাতে উপকার দেবে না এমন কোন কাজে সে এক মুহূর্তও নষ্ট করবে না। আমরা দেখতে পাব, সে তার জান, মাল, চিন্তা-শ্রম ও যাবতীয় মালিকানাধীন বস্তু কোন দ্বিধা-সংকোচ ও কার্পণ্য না করে আল্লাহ্র রাহে বিলিয়ে চলেছে। আমার মনে হয় সে পাপ কাজে একটুও অগ্রসর হবে না; বরং তার মনে উহার কল্পনাও জাগবে না। কি করেই বা জাগবে! সে তো আল্লাহ্পাকের সাক্ষাত এবং তার সামনে হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান প্রাপ্তির জন্যে প্রস্তুতিতে ব্যস্ত।

আমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে তার আয়ুষ্কাল ছয় মাস, কিংবা কয়েক দিন কিংবা কয়েক ঘন্টা কিংবা কয়েক মিনিট এমনকি ষাটটি সেকেণ্ড পর্যন্ত আছে বলে গ্যারান্টি দিতে পারে? তাহ'লে আমরা কেন নিজেদেরকে উক্ত অসুস্থ ব্যক্তির অনুরূপ ভাবব না? এবং আল্লাহপাকের সাক্ষাতের অপেক্ষায় তার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করব না? এই মৃত্যু তো হঠাৎই এসে পড়বে। 'কোন জীব জানেনা আগামী কাল সে কী উপার্জন করবে এবং কোন জীব জানে না কোন যমীনে সে মারা যাবে' *(লুক্বমান ৩৪)*।

সুতরাং ভাল কাজের কোন সুযোগ আপনার সামনে এলে আপনি তাকে বিলম্বিত করবেন না; বরং তাকে মূল্যবান মনে করে কাজে লাগান। কেননা আপনার ও ঐ সুযোগের মাঝে প্রতিবন্ধক খাড়া হয়ে যেতে পারে। বরং ভাল কাজের সুযোগ আপনিতে এসে ধরা দেবে এমন অপেক্ষায়ই থাকবেন না। আপনি নিজেই তার চেষ্টা ও অনুসন্ধানে রত হউন। এতে আপনিও তাদের মধ্যে পরিগণিত হবেন যাদের প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেছেন, 'তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করে এবং সেজন্য তারা অগ্রবর্তী' *(মুমিনূন ৬১)*। দুনিয়ার বস্তুগত সামান্য কিছু উপার্জনের জন্য আমরা দেখি অনেকেই দূর-দূরান্ত সফর করেন, রাত জেগে পরিশ্রম করেন এমনকি আহার-নিদ্রা পর্যন্ত ভুলে যান। তাহ'লে আমরা কেন শিক্ষা গ্রহণ করছি না এবং আল্লাহ্পাকের সাথে আমাদের ব্যবসায়ে শ্রম ও চেষ্টা ব্যয় করছি না? অথচ উভয় ব্যবসা ও তাদের লাভের মাঝে কত তফাৎ!

প্রিয় ভাই! আপনি লেগে থাকুন এবং আপনার সাধ্যমত নিবেদিতপ্রাণ হয়ে আল্লাহ্র জন্য কাজ করুন, শরী'আতের পাবন্দ থাকুন এবং আল্লাহ্র হুকুমের উপর অবিচল থাকুন। আপনি এই কামনা করুন যে, কারো ঋণ আপনার যিম্মায় থাকা অবস্থায় যেন আপনার মৃত্যু না হয়। আর আল্লাহ্র ঋণই অগ্রে পরিশোধ যোগ্য। আপনার মনের বাসনা যেন এমন হয় যে, আপনি আল্লাহ্র সান্নিধ্যে যাত্রাকালে আপনার মুসলিম ভাইদের প্রতি নির্মল মন নিয়ে যেতে পারেন। জেনে রাখুন, আল্লাহ্র পথে ভ্রাতৃত্বের নিম্নতম স্তর মনের নির্মলতা বা শুচিতা এবং সর্বোচ্চ স্তর তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা। সুতরাং এ অবস্থা ছাড়া যেন আপনার একটি রাতও না কাটে, সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন।

ভ্রাত! মৃত্যু আসার আগেই আপনি তওবা ও গুনাহ মাফের দো'আ করতে থাকুন। কেননা মৃত্যু যখন আসন্ন হয়ে পড়ে তখন তওবা কবুল হয় না। 'আল্লাহ্র নিকটে তো কেবল তাদেরই তওবা গৃহীত হয়, যারা না জেনে খারাপ কাজ করে ফেলে, তারপর সহসাই তওবা করে। এদের তওবা আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়' *(নিসা ১৭)*।

মৃত্যুর পর্যায়ঃ

মৃত্যুর পর্যায়টি আমাদের বর্তমান জীবন ও আমাদের জন্য অপেক্ষমান গায়েব বা পরকালীন জীবনের মাঝে একটি কল্পিত আবরণ বিশেষ। আমরা সবাই যে মারা যাব, এ ব্যাপারে আমাদের কারো কোন সন্দেহ নেই। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'প্রত্যেক জীব মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী' *(আলে ইমরান ১৮৫)*। মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে গেছে এমন কাউকে আমরা দেখিনি। তা সত্ত্বেও আমরা বহু লোককে দেখতে পাই, তারা মৃত্যুর কথা একেবারে ভুলে গেছে। দুনিয়া নিয়ে তাদের ব্যতিব্যস্ততা দেখে মনে হয় মৃত্যু তাদের নয়; বরং অন্যদের জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের কর্তব্য, মৃত্যুকে সর্বক্ষণ স্মরণ করা এবং আল্লাহপাকের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সামান প্রস্তুত করতে থাকা। যখন শয়তান কোন মানুষকে পাপ কাজের কুমন্ত্রণা দেয় এবং সে মৃত্যুকে স্মরণ করতে থাকে তাহ'লে মৃত্যুর স্মরণই তাকে তখন ঐ পাপ থেকে রক্ষা ও শয়তানের কুমন্ত্রণা হ'তে বাঁচার যিম্মাদার হ'তে পারে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও আমাদেরকে মৃত্যুর কথা সার্বক্ষণিক স্মরণের পথ বাতলিয়েছেন। যেমন ঘুম ও জাগরণের দো'আয় একথা রয়েছে।

প্রিয় ভাই! সৎ জীবন যাপন কালে আপনার মৃত্যু আসুক এমন আগ্রহ আপনি মনে লালন করবেন। আপনি আল্লাহ্র হুকুমের উপর সুদৃঢ় থাকুন এবং আল্লাহভীরু হয়ে যান। 'ফেরেশতাগণ যাদের পাক পবিত্র অবস্থায় রূহ কবয করেন তাদেরকে বলেনঃ তোমাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক, তোমরা যে আমল করতে তার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ কর' *(নাহল ৩২)*।

আপনার জন্মের সময় আপনি কেঁদেছিলেন আপনার পাশে যারা ছিল তারা আনন্দে হেসেছিল। অতএব আপনি জীবনকে এমনভাবে তৈরী করুন যাতে মৃত্যুর দিনে তারা আপনার পাশে বসে কাঁদে কিন্তু আপনি আনন্দ খুশীতে উদ্বেল থাকেন। আপনি আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাতকে ভালবাসুন! আল্লাহও আপনার সঙ্গে সাক্ষাতকে ভালবাসবেন।

এই মৃত্যুকে আপনি আল্লাহ্র রাস্তায় ঘটাতে সচেষ্ট হউন। এটা যেন আপনার সবচে বড় আশা হয়। আপনার মৃত্যু যেন জীবনে পর্যবসিত হয়। আল্লাহ্র পথে শহীদ হ'লে এ মর্তবা পাওয়া যাবে। আল্লাহ বলেছেন 'যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনই মৃত বলে ধারণা করো না। বরং তারা জীবিত, তাদের প্রভুর নিকটে রিযিক প্রাপ্ত হয়' *(আলে ইমরান ১৬৯)*।

ইতিপূর্বে যদি আপনি আল্লাহ্র সঙ্গে লাভজনক চুক্তিতে আবদ্ধ না হয়ে থাকেন তাহ'লে এখনই তা সেরে ফেলুন। তার নিকট আপনার জান-মাল বেঁচে দিন। বিনিময়ে জান্নাত লাভ করুন, যার প্রশস্ত আসমান-যমীনের সমান। এই চুক্তির পর মৃত্যু যখন আসবে এক মুহূর্ত পরেও যদি তা আসে- আপনি সফলতা লাভ করবেন এবং মূল্যও পাবেন। আর যদি মৃত্যু বিলম্বিত হয় তাহ'লে আপনি আপনার অঙ্গীকার ও চুক্তি পূরণে সদা-সর্বদা অবিচল থাকুন। কোন দ্বিধা-সংকোচ ও কার্পণ্যকে মনে স্থান দিবেন না। আল্লাহ বলেছেন, 'আর যে কৃপণতা করে সে তো নিজের পক্ষ হ'তে কৃপণতা করে। আল্লাহই ধনী ও তোমরাই দরিদ্র। যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য একটি জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না' *(মুহাম্মাদ ৩৮)*। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন' *(তাওবা ১১১)*।

কবর ও বরযখের জীবনঃ

আসুন! আমরা কবরের প্রসঙ্গে যাই। মৃত্যুর পর কবর যিয়ারতের আগে বেঁচে থাকতেই আমরা কবর দেখে নেই। আসুন! আমরা পরিচিত হই কবরের সাথে এবং সেখানে জীবনের প্রকৃতি কিরূপ হবে তার সাথে। আমরা তার জন্যে প্রস্তুত হই এবং আমাদেরই ভবিষ্যতের জন্য তাকে তৈরী করে রাখি। সিমেন্ট, বালি, মোজাইক-সিরামিকের তৈরী সমাধি সৌধ আকারে নয়। কেননা কবরবাসীদের উপর এগুলির কোনই প্রভাব নেই। আমরা বরং কবর থেকে সেই শিক্ষা গ্রহণ করব যা আমাদেরকে সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করবে। এই আমলই আমাদের সঙ্গে কবরে যাবে। আমলের ফলেই কবর জান্নাতের বাগিচা কিংবা দোযখের গর্ত হবে। কবরের মধ্যে যে জীবন তা হবে একটি সীমিত অন্তর্বর্তীকাল। তারপরই হবে পুনরুত্থান হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ এবং বিচার-ফায়ছালা। মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন, প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে গাফেল রাখে, এমনকি তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও' *(তাকাছুর ১-২)*।

এই সময়ে জীবনের স্বরূপ যে কেমন হবে তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তবে নিঃসন্দেহে তা আমাদের বর্তমান জীবন ধারণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। রূহ এই নশ্বর দেহ থেকে পৃথক হয়ে যাবে। তবে কুরআন সুন্নাহতে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে তাতে এই জীবনের সদৃশ জীবনের কথাই পাওয়া যায়। যেমন, শহীদগণ জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা রিযিক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের সামনে কিরূপ জীবন নিয়ে বেঁচে আছে তা আল্লাহপাকই অধিক জ্ঞাত আছেন। কবরে জিজ্ঞাসাবাদ ও আযাবের কথা রয়েছে, যার থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করতে মহানবী (ছাঃ) আমাদেরকে বারংবার উদ্বুদ্ধ করেছেন।

কুরআন আমাদেরকে ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের কবর আযাবের কথা তুলে ধরেছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'সকাল-সন্ধ্যায় তাদের উপর আগুন তুলে ধরা হয়। আর যেদিন ক্বিয়ামত কায়েম হবে সেদিন (বলা হবে) ফেরঊনপন্থীদের কঠিনতম আযাবের মধ্যে দাখিল কর' *(মুমিন ৪৬)*।

কবরের আযাবের কথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছেও মেলে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছাঃ) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তারা আযাবে গ্রেপ্তার ছিল। বড় কোন ব্যাপারে তাদের আযাব হচ্ছিল না, তাদের একজন পেশাব ফিরে পাকসাফ হ'ত না, আর অন্যজন পরের দোষ গেয়ে বেড়াত' *(বুখারী-মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৪২ 'পেশাব পায়খানায় শিষ্টাচার' অধ্যায়)*।

আমাদের উচিত কবর ও তার মধ্যকার জীবনকে সব সময় স্মরণে রাখা। কেননা কবর তো আমাদের থেকে দূরে নয়। এমনও দেখা যায় আমাদের কেউ সকাল বেলা নিজ গৃহে পরিবারের সকলকে নিয়ে কাটিয়েছে অথচ বিকাল বেলায় সেই একাকী কবরের মধ্যে চলে গেছে।

এ উপলক্ষ্যে জনৈক ভাইয়ের মনোভাব যা আল্লাহ তাকে দান করেছিলেন তা না উল্লেখ করে পারছিনা। ঐ ভাইটিকে গভীর রাতে স্বৈরাচারী সরকারের সৈন্যরা বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে এক গাঢ় অন্ধকার কুঠুরীতে তালাবদ্ধ করে রেখেছিল। গাঢ় অন্ধকারের জন্য সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। তখন তার মনে এ ভাবের উদয় হয়। তার মনে হয় তিনি দুনিয়া থেকে কবরে চলে এসেছেন। এখন তিনি হিসাব-কিতাবের মুখোমুখি হ'তে যাচ্ছেন। কিন্তু তার আমল আযাব থেকে

মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। ফলে তিনি ভীত-চকিত হয়ে পড়েন এবং কামনা করতে থাকেন আল্লাহ যেন তাকে দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেন। যাতে তিনি সংশোধিত হয়ে নেক আমল করতে পারেন। আল্লাহ যেন তার আশা পূরণ করেছিলেন। এখন দুনিয়াতে (অন্ধ কুঠরী থেকে মুক্তি পেয়ে) এসে সে নতুন করে আমলের সুযোগ পেয়েছে এবং নিজেকে শুধরিয়ে নিয়েছে। বর্তমানে এই সুগভীর ক্রিয়াশীল মনোভাব হেতু তার জীবন একটি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু যদি সে কিছু সময় অন্ধকার কুঠরীতে থাকত আর কিছু সময় পরিবারের সঙ্গে কাটিয়ে আবার তথায় ফিরে যেত তাহ'লে কোনই ভয়-ভীতি ও দুঃখ-কষ্ট তার স্পর্শ করত না। এ চেতনাই আজ আমাদেরকে অনেকাংশে আল্লাহ্র আযাবকে সহজ করে তুলেছে। মনের যথার্থ উপলব্ধি কিন্তু ভাল কাজের শক্তি যোগায় এবং প্রতিটি সৎ কাজে দ্রুত ধাবিত হ'তে উদ্বুদ্ধ করে যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় ও তার আযাব থেকে বাঁচা যায়।

গায়েব বা অদৃশ্য জগতের এই স্তরগুলির সামান্য যা আলোচিত হ'ল তা যেন আমরা বহুবার পড়ি এবং সর্বক্ষণ তা স্মরণ করি। তাতে আমরা বিপদ হ'তে রক্ষা পাওয়ার মত সম্বল কিছু পেয়ে যাব এবং সরল সঠিক পথে চলতে সাহায্য পাব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহই সাহায্যস্থল।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সু-খবর সু-খবর

তাবলীগে দ্বীনের উপর কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক রচিত

বিশ্ব নবী (ছাঃ)-এর দা'ওয়াত ও তাবলীগের সঠিক পদ্ধতি

☐ বের হয়েছে! ☐ বের হয়েছে! ☐ বের হয়েছে!

আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন।

লেখকঃ হাফেয মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ

সম্পাদনাঃ মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

☐ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ঢাকা যেলা কার্যালয় ২২০ বংশাল রোড, ২য় তলা, ঢাকা-১১০০। ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯
☐ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, কাজলা, রাজশাহী।
☐ তাওহীদ পাবলিশার্স, ৯০ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল।
☐ হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, ২০৭ বাংলাবাজার, ২য় তলা, ঢাকা।

মূল্যঃ ২০.০০ (বিশ টাকা) মাত্র।

আল্লাহ্র আনুগত্য

*এডভোকেট গিয়াছুদ্দীন আহমাদ**

আমরা মুসলিম। আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণকারী। আমরা আল্লাহ্র একান্ত অনুগত বান্দা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা করতে, যেভাবে করতে, যা বলতে, যেভাবে বলতে এবং যেভাবে চলতে আদেশ করেছেন, সেভাবে করার, বলার ও সেভাবে চলার নাম তাঁর অনুগত হওয়া। অনুরূপ তিনি যা করতে, বলতে, খেতে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকার নামও তাঁর আনুগত্য করা। মোটের উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ পালন এবং নিষেধ বর্জন করাই বান্দার দায়িত্ব ও কর্তব্য। মুসলিম বলতে আল্লাহ্র নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী পূর্ণ অনুগত বান্দাকেই বুঝায়।

মুসলিম জাতির জনক হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র আনুগত্যের যে নিদর্শন রেখে গেছেন, তা সর্বকালের সকল মুসলিমের জন্য অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি ছিলেন আল্লাহ্র নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী। তাঁকে যখন তাঁর প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বললেনঃ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ– 'অনুগত হও! তিনি বললেন, আমি সমগ্র জাহানের প্রতিপালকের অনুগত হ'লাম' *(বাক্বারাহ ১৩১)*।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনুগত হওয়ার মানেই হচ্ছে আল-কুরআনের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ বিনা বাক্যব্যয়ে অম্লান বদনে মেনে নেওয়া। আসলে কি আমরা নির্দ্বিধায় তা মানি? মানি না। আর মানার মত মন মানসিকতাও আমাদের নেই। ফলে আমাদের আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার আশাও দুরাশারই নামান্তর। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মহান আল্লাহ বলেনঃ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَاتُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের। আর তোমাদের আমলগুলিকে বরবাদ করে দিও না' *(মুহাম্মাদ ৩৩)*।

এ হচ্ছে আল্লাহ্র সুস্পষ্ট নির্দেশ। বিনা বাক্যব্যয়ে আনুগত্য করতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র এবং তাঁর রাসূলের। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) ছাড়া আর কারো আনুগত্য করা অপরিহার্য নয়। এর বাইরে কারো আনুগত্য করলে নিজেদের আমলগুলি বরবাদ হওয়ার সমূহ আশংকা বিদ্যমান।

আমরা যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করি, তারা স্বীকার করে থাকি যে, আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্র আনুগত্য করেছেন। আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। আর আমরা? আমরা কি তা করি? করি না। না করলে তার

* প্রাক্তন সরকারী উকিল, নারায়ণগঞ্জ, আইন উপদেষ্টা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, নারায়ণগঞ্জ।

পরিণাম কি হবে তা কি আমরা ভেবে দেখেছি?

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ আদেশ করলেন, أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ 'তোমরা ছালাত প্রতিষ্ঠা কর আর যাকাত প্রদান কর' *(বাক্বারাহ ৪৩)*। কিন্তু আল-কুরআনে ছালাতের পদ্ধতির কোন বর্ণনা দেওয়া হয়নি, যাকাতের বিধি-বিধানও বর্ণিত হয়নি। অথচ পবিত্র কুরআনে ছালাত এবং যাকাত সম্পর্কে বিভিন্ন আয়াতে বহু তাকীদ এবং সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বস্তুতঃ মহান আল্লাহ ছালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত পরিশোধের তাকীদ দেবেন আর এতদুভয়ের নিয়ম-কানূন ও পদ্ধতি শেখাবেন না এমনটি হ'তে পারে না। মূলতঃ 'অহিয়ে মাতলু' পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় ছালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত পরিশোধের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আর 'অহিয়ে গায়ের মাতলু' ছহীহ সুন্নাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে অবশ্য অবশ্যই ছালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত পরিশোধের নিয়ম-পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন।

যেমনিভাবে মহান আল্লাহ হযরত জিবরীল (আঃ)-এর মাধ্যমে তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে বাস্তবে কুরআন শিখিয়েছেন। তেমনিভাবে কুরআনে বর্ণিত ছালাত ও যাকাতের নিয়ম-পদ্ধতি এবং বিধি-বিধানও শিখিয়েছেন। তাই আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে যেভাবে আদায় করতে বলেছেন, সেভাবেই ছালাত আদায় করতে হবে। আর যে নিয়মে যাকাত আদায় করতে বলেছেন, সে নিয়মেই আদায় করতে হবে।

শুধুমাত্র ছালাত এবং যাকাতই নয়; বরং সর্বপ্রকার ইবাদত-বন্দেগীর রীতি-পদ্ধতি এবং নিয়ম-কানূনই আল্লাহ্‌র রাসূলের মাধ্যমে আমাদেরকে শিখতে হবে এবং তাঁর অনুসরণেই সকল ইবাদত-বন্দেগী এমনকি দৈনন্দিন জীবন-যাপন সহ পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, আচার-অনুষ্ঠান, বিচার-মীমাংসা তথা যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে। তবেই হবে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ। আর তখনই আমরা সত্যিকার অর্থে মুসলিম এবং মুমিন হ'তে পারব।

আসলে আমরা কি সর্বতোভাবে আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলের আনুগত্য করি? না, আনুগত্য করি না। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, দণ্ডবিধি, বিচার-মীমাংসা ইত্যাদি কোন ব্যাপারেই না। ধরুন, ছালাতের কথাই বলি- আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) যেভাবে ছালাত আদায় করেছেন, আমরা অনেকেই সেভাবে ছালাত আদায় করি না। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলে দিয়েছেন, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّىْ 'আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখছ, সেভাবেই তোমরা ছালাত আদায় কর'।[১]

১. *বুখারী, 'আযান' অধ্যায় ১/৮৮ পৃঃ; মিশকাত হা/৬৮৩।*

এটা আল্লাহ্‌র রাসূলের আদেশ। এই আদেশ অমান্য করে যদি আমরা ছালাত আদায় করি তাহ'লে কি আমাদের ছালাত আদায় হবে? আর যদি না হয় তবে আমাদের পরিণাম সম্বন্ধে আমরা ভেবে দেখেছি কি? আসলে কি আমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের আনুগত্য করি? আমরা অনেকেই ছালাত আদায় করি। কিন্তু রাসূল যেভাবে ছালাত আদায় করেছেন আমাদের ছালাত সেভাবে আদায় হচ্ছে কি-না তা আমরা অনেকেই অনুসন্ধান করে দেখছি না। আমাদের ছালাত রাসূলের ছালাতের অনুরূপ না হ'লে সেই ছালাত তো জান্নাতের চাবি হবে না, হ'তে পারে না।

আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তাঁর ছালাতে তাকবীরে তাহরীমার সময় স্বীয় হাত দু'খানা কাঁধ বরাবর উঠিয়ে বুকের উপর বাঁধতেন। তিনি রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ' থেকে মাথা উঠাবার সময় তাঁর হাত দু'খানা কাঁধ বরাবর উঠাতেন। তিনি বলেছেনঃ لاَصَلاَةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 'যে ব্যক্তি ছালাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করে না, তার ছালাত হয় না'।[২] মানুষের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ছালাতে রাসূলের আনুগত্য না থাকলে সেই ছালাত কি আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে? রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য না করে অন্য কারো আনুগত্য করতে গিয়ে ছালাতকে বিকৃত করার ফল নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক হ'তে বাধ্য।

অনুরূপভাবে বাংলাদেশের আদালতে আল্লাহ্‌র আইনের বদলে মানব রচিত তাগূতী আইনের অনুশীলন চলছে। যা কোনক্রমেই আল্লাহ্‌র নিকটে গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে না। আল্লাহ তো বলে দিয়েছেন وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলের অবাধ্য হবে, সে তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিপতিত' *(আহযাব ৩৬)*।

আমাদের অনুসরণীয় করে আল্লাহ রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। কোন ইমাম, আম্বিয়া, পীর, মাশায়েখ, অলী, আওলিয়া আমাদের অনুসরণীয় বলে আল্লাহ্‌র তরফ হ'তে কোন দলীল-প্রমাণ নেই। তাঁরা কেউ আমাদের আদর্শ নন। আমাদের আদর্শ হচ্ছেন আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ মোস্তফা (ছাঃ)। মহান আল্লাহ আমাদেরকে ফির্কাবন্দী, পীর-পরস্তী ও তাক্বলীদী বিভ্রান্তির অভিশাপ থেকে হেফাযত করুন এবং সার্বিক জীবনে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত 'ছালাতে ক্বিরা'আত' অনুচ্ছেদ হা/৮২২।*

মৃত্যুঃ এর জন্যে আমরা কি প্রস্তুত?

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান**

আমরা অনেকেই ধারণা করতে পারি না যে, আমাদের বাড়ীতে অকস্মাৎ একজন মেহমান এসে হাযির হ'লে তাকে কিভাবে অভ্যর্থনা জানাব? কিভাবে সম্ভাষণ জানাব? কি দিয়ে আপ্যায়ন করব? নবাগত মেহমানের উপস্থিতিতে বাড়ীময় শোরগোল পড়ে যায়। তবে আমি যে মেহমানের কথা বলতে চাচ্ছি তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অতীব ক্ষীণ, নিতান্তই অপ্রতুল। তিনি হ'লেন আমাদের জীবনের শেষ মেহমান 'মালাকুল মওত'। তাকে আমরা সবাই 'আযরাঈল' নামে জানি। যদিও আযরাঈল পরিভাষাটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোথাও পাওয়া যায় না। তিনি জীবন-মরণের একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে আসেন মৃত্যু পরওয়ানা নিয়ে (He has come to cry out a high command and that his Job)।[১]

যখন 'মালাকুল মওত' এলেন, সঙ্গে সঙ্গে জীবনের খেলা শেষ হয়ে গেল। ঠিক যেন ক্রিকেট খেলায় ব্যাটস্‌ম্যানের দিকে বল ছুড়ে উইকেটে বল লাগিয়ে ব্যাটস্‌ম্যানকে আউট করা এবং ইনিংস শেষে Pavilion বা শিবিরে ফিরে যাওয়া। এ সম্পর্কে ডাঃ ইবরাহীম কাযীম বলেন, When the Angel of death comes, the game is over. We are bowled out. There can be no appeal and we have to return to the pavilion In our case the earth. Some of us might have scored boundaries and sixes in our spiritul field; While some of us might have been bowled out for Naught.[২]

খেলার ব্যাপারে যেমন আপীলের সুযোগ নাই, মানুষের জীবনের ক্ষেত্রেও তাই। ফিরে যেতেই হবে। ফেরেশতা কস্মিনকালেও জিজ্ঞেস করবেন না যে, আপনি হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী, চিশতিয়া, মুজাদ্দেদী না অন্য কোন তরীকার অনুসারী? মৃত্যুকালে আমরা যতই আতংকগ্রস্ত হইনা কেন তাতে রূহ কবয করার নির্ধারিত সময়ের একটুও এদিক ওদিক হবে না।

'মালাকুল মওত'-এর উপর আল্লাহ তা'আলা এমন এক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যে, আমরা যেখানে, যে লৌহ দুর্গে অথবা সুউচ্চ টাওয়ার অথবা মিনারেই লুকিয়ে থাকি না কেন 'মালাকুল মওত' সেখানে পৌছেই তড়িত্ব তাঁর কার্য সমাধা করবেন। আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র, ছেলে-মেয়ে অতি সন্নিকটে থেকেও মৃত্যু পথযাত্রীকে রক্ষা করতে পারে না।

নিঃসন্দেহে মৃত্যু অত্যন্ত ভয়ানক এবং বাস্তব ঘটনা। মৃত্যুই আমাদেরকে ডেকে বলে যে, তোমরা সাবধান হয়ে যাও অত্যাচার ও ঔদ্ধত্য থেকে ফিরে আস। মহান আল্লাহ বলেন,

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً-

'তিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ...' (*মুলক ২*)। মহান আল্লাহ আরো বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ-। 'প্রত্যেক আত্মাকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে' (*আলে ইমরান ১৮৫*)।

মৃত্যু হচ্ছে জীবনের পূর্ণ বিরতি। ডাঃ ইবরাহীম কাযীম বলেন, "Death puts a full stop to what ever we wish to do again in this world good or bad".[৩] মজার ব্যাপার হ'ল, মৃত্যুর সময় আত্মা ও শরীর এই দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। আমাদের রূহ বা আত্মা তখন মালাকুল মওত-এর সাথে উর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ শুরু করে। কোথায় যায়? এমন এক গ্রহে নিয়ে যাওয়া হয়, যা পৃথিবী হ'তে প্রায় ২,৯৩,৭৩০ ট্রিলিয়ন মাইল দূরে। যাওয়ার গতি আলোকাষ্ট হিসাবে ১৮৬.২৮২ মাইল। ডাঃ ইবরাহীম কাযীমের ভাষায় "Our Rooh (Soul) Would travel with the Angel of Death, Probably to planet Nearly 293730 trillion miles away from this earth, at the speed light at 186. 282 miles".[৪]

বড় পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের অনেক জ্ঞানী-গুণী, শিক্ষিত, বরেণ্য ব্যক্তি বিশ্বাস করতেই চান না যে, এ শরীর, এ গঠন, এ অবয়ব, হাড়-মাংস পচে খসে ধূলায় পরিণত হবার পর তাকে পুনরায় শারিরীক গঠনের মাধ্যমে উপস্থিত করা হবে। পুনরুত্থিত করা হবে। তারা একে স্রেফ ধর্মীয় কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেন । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ط أُولَئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلاَلُ فِىْ أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-

---

* *এম, এ, (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), সাধুর মোড়, রামচন্দ্রপুর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।*

১. *Dr. Ebrahim Kazim, Essays on Islamics Topics, P. 114.*

২. *Ibid.*

৩. *Ibid, p- 115.*

৪. *Ibid, p- 115.*

'যদি আপনি বিস্ময়ের বিষয় চান, তবে তাদের একথা বিস্ময়কর যে, আমরা যখন মাটি হয়ে যাব, তখনও কি নতুনভাবে সৃজিত হব? এরাই স্বীয় পালনকর্তার সত্তায় অবিশ্বাসী হয়ে গেছে, এদের গর্দানেই লৌহ-শৃংখল পরানো হবে এবং এরাই জাহান্নামী। এরা তাতে চিরকাল থাকবে' *(রা'দ ৫)*।

আমরা অনেকেই এই ধারণা পোষণ করি যে, আমাদের মৃত্যুর পর নির্ধারিত হাশর বা শেষ বিচারের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কবরেই কোটি কোটি বৎসর অবস্থান করব। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْا إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ط قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ-

'এবং যেদিন তিনি তাদেরকে সমবেত করবেন সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা অবস্থান করেনি, তবে দিনের একদণ্ড। তারা পরস্পরকে চিনবে। নিঃসন্দেহে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতকে এবং যারা সরল পথে আসেনি' *(ইউনুস ৪৫)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَهَا-

'যেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে' *(নাযি'আত ৪৬)*। এরপরে আমরা যখন জাগ্রত হব, মনে করব এইতো একটু আগেই তন্দ্রায় পেয়েছিল। অথচ এরই মাঝেই কোটি কোটি বৎসর কেটে যাবে। হ্যাঁ, মৃত্যু সম্বন্ধে আমরা এত গাফেল যে, তা কল্পনাই করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্ম সমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্য উত্তম। যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালনা করব ও আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর এবং আমি মানুষকে একত্রিত করব। অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না। তাদেরকে আপনার পালনকর্তার সামনে পেশ করা হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবেঃ তোমরা আমার কাছে এসে গেছ; যেমন তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম। তোমরা মনে করতে, আমি তোমাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না। আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে, তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবে, হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা! এ যে ছোট-বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি। সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি যুলুম করবেন না' *(কাহফ ৪৬-৪৯)*।

আমাদের আমলনামা যা আমরা অর্জন করেছি এ জগতে সব কিছুই আমাদেরকে দেখানো হবে। জাগতিক এ জগতে আমরা দৈনন্দিন কার্যাবলীর নানান আচার-অনুষ্ঠানের হাসি-তামাশা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতির দৃশ্যাবলী যেমন ভিডিও, ক্যাসেট-এর মধ্যে বন্দী করে রাখি এবং তা পরবর্তীতে সুখানুভূতি বা অতীতের স্মৃতিচারণের জন্য সযত্নে রেখে দেই। মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা এর চেয়েও বিস্ময়কর বস্তুতে মানুষের জীবনের যাবতীয় কার্যাবলী রেকর্ড করে রেখেছেন।

আল্লাহ হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, 'যারা আমার আদেশ মেনে চলেছে তারা দুর্ভাগ্য, পীড়িত এবং অপমানিত হবে না। আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণ বর্জন করেছে তার জীবন হবে সংকীর্ণ। রোজ হাশরের দিন আমি তাকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় উঠাব। তখন সে বলবে 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে অন্ধ করে কেন উঠালে, অথচ আমি দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ছিলাম'। তখন আল্লাহ বলবেন, 'তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী পৌঁছেছিল কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। তাই আজ তোমাকেও ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে' *(ত্বা-হা ১২৬)*।

অপমান, পরাজয়, দুর্বলতা, অধঃপতন, অভাব-অনটন ইত্যাদি আসে আল্লাহ্র বিরোধিতার কারণেই। আমরা দেখতে পাই যে, ক্ষমতার দম্ভে মদমত্ত অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠী একেবারে ভুলে বসেছে যে, একদিন তাদেরকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে। তারা আল্লাহ্র নির্ধারিত মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে আল্লাহ্র বান্দাদের উপর যুলুম ও ত্রাসের শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ সময় ও যুগের গতি তাঁরই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। রাতের পর দিন, বংশের পর বংশ আসা-যাওয়া, জীবনের শুরু ও শেষ, শরীরের ক্রমবৃদ্ধি ও ক্ষয়, প্রাণের সঞ্চার, সমাপ্তি ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহ্র হুকুমে হচ্ছে।

ওহে অত্যাচারী শাসক! তোমার দম্ভ, অহংকার, এসব ধনদৌলত, শক্তি-অস্ত্র, গার্ড বাহিনী, বিশেষ বাহিনী, বিশেষ নিরাপত্তা, সৈন্যবাহিনী, বিশেষ ভবন কিছুই সেদিন তোমার কাজে আসবে না। সবকিছুই পড়ে থাকবে আর আল্লাহ্র দরবারে তুমি ঠিক সেভাবেই নিঃস্ব অবস্থায় পৌঁছবে যেমনভাবে তুমি মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলে। অতএব সর্বাগ্রে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণই অত্যাবশ্যক। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাহফীক দিন! -আমীন!!

মনীষী চরিত

ইমাম বুখারী (রহঃ)

*ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী**

প্রারম্ভিকাঃ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্রোতধারা বক্ষে ধারণ করে ও ইলমে হাদীছের অকূল সাগরে অবগাহন করে যারা অবগুণ্ঠিত বিক্ষিপ্ত হাদীছ সমূহকে সংকলন করে বিশ্ব মুসলিম মিল্লাতের মাঝে অবিস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত। বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে এবং তা অমলীন থাকবে চিরকাল ইনশাআল্লাহ। তিনি যেন হাদীছ শাস্ত্রের উজ্জ্বল আকাশের পূর্ণিমার শশী।

হাদীছ ইসলামী আইন শাস্ত্রদ্বয়ের দ্বিতীয়তম। কুরআন ইসলামী আইন শাস্ত্রের প্রদীপ্ত স্তম্ভ, হাদীছ তার বিচ্ছুরিত আলোর বন্যা। আলোহীন প্রদীপ যেমন অলীক তুল্য, তেমনি ছহীহ হাদীছের আলোবিহীন কুরআনের মর্মার্থ উদঘাটন অন্তঃসারশূন্য। আর এ ছহীহ হাদীছ শাস্ত্র সংকলনে ইমাম বুখারী (রহঃ) ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

কালের পরিক্রমায় শাশ্বত ইসলামে অনেকগুলি দল-উপদল সৃষ্টি হয় এবং কতিপয় অসাধু নিজ নিজ মতবাদকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অসংখ্য জাল হাদীছ প্রণয়ন করে বিশ্ব মুসলিমকে গোলক ধাঁধায় ফেলে। তাই ইমাম বুখারী (রহঃ) উছূলে হাদীছের কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই করে একটি অনুপম বিশুদ্ধতম হাদীছ শাস্ত্র সংকলন করে মৃতপ্রায় ইলমে হাদীছকে পুনর্জীবিত করেন।

নামঃ

তাঁর নাম মুহাম্মাদ।[১] পিতার নাম ইসমাঈল।[২] কুনিয়াত আবু আব্দুল্লাহ বুখারী,[৩] উপাধি আমীরুল মুমেনীন ফিল হাদীছ।[৪] পুরো বংশ পরিক্রমা হ'লঃ শায়খুল ইসলাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরা ইবনে বারদিয্‌বাহ।[৫]

জন্ম ও পরিচয়ঃ

তিনি ১৯৪ হিজরী সনের ১৩ই শাওয়াল মাসে বাদ জুম'আহ[৬] খোরাসানের (বর্তমান স্বাধীন উজবেকিস্তান) অন্তর্গত বুখারা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[৭] শৈশব কালেই তাঁর পিতা ইহলোক ত্যাগ করেন। মায়ের স্নেহময় ক্রোড়ে তিনি আশৈশব লালিত-পালিত হন।[৮] বাল্যকালেই তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সে জন্য তাঁর মহিয়সী জননী আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ করতে থাকেন। একদা তিনি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে স্বপ্নে দেখতে পেলেন। স্বপ্নযোগে তিনি তাঁকে বললেন, 'তোমার প্রাণঢালা দো'আ এবং করুণ ক্রন্দনের দরুণ আল্লাহ তোমার পুত্রধনের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। নিদ্রাভঙ্গের পর জননী দেখলেন, স্বপ্ন সত্যরূপেই বাস্তবায়িত হয়েছে। তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ দৃষ্টিশক্তি লাভে ধন্য হয়েছেন।[৯]

তিনি হালকা-পাতলা দেহবিশিষ্ট ছিলেন। বেশী লম্বাও ছিলেন না, আবার বেঁটেও ছিলেন না। মধ্যমাকৃতির লোক ছিলেন।[১০] তিনি অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। শৈশব থেকেই তাঁর অদ্ভুত মেধা ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সকলকে চমৎকৃত করে তুলে। দশ বছর বয়সেই তিনি কয়েক হাযার হাদীছ মুখস্থ করেন। তৎপূর্বেই তিনি কুরআন মাজীদ হিফয সম্পন্ন করেন। তিনি একবার যা শুনতেন কখনও তা ভুলতেন না।[১১] আল্লামা খতীব বাগদাদী তাঁর 'তারীখে' লিখেছেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) ইলমে হাদীছের সন্ধানে সমস্ত শহরের সকল মুহাদ্দিছের নিকটই উপস্থিত হয়েছেন।[১২] তিনি এক হাযার মুহাদ্দিছের নিকট থেকে হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ ও হাদীছ সংগ্রহ করেন।[১৩]

ছহীহ বুখারী সংকলনের প্রেক্ষাপটঃ

প্রথম কারণঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন,

رأيت النبى صلى الله عليه وسلم كأننى واقف بين يديه وبيدى مروحة أذبُّ بها عنه فسألت بعض المعبرين فقال لى انت تذب عنه الكذب فهوالذى حملنى على إخراج الجامع الصحيح-

'আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি যেন তাঁর সম্মুখে পাখা হাতে নিয়ে দণ্ডায়মান, যা দ্বারা আমি তাঁকে বাতাস করছি ও মাছির আক্রমণ প্রতিরোধ করছি। অতঃপর কতিপয় স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীদের নিকট এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি আরোপিত মিথ্যা হাদীছ প্রতিরোধ করবেন। বস্তুতঃ এ স্বপ্ন ও ইহার ব্যাখ্যাই আমাকে ছহীহ

---

* পরিচালক, ইসলামিক এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট একাডেমী, রেলওয়ে ষ্টেশন রোড, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

১. ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ, ১৯৯৬ ইং/১৪১৭ হিঃ), পৃঃ ৩০।
২. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী, (কায়রোঃ দারুর রাইয়ান লিত্-তুরাছ, ১৯৮৬/১৪০৭ হিঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫।
৩. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩০।
৪. ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১ শিরোনাম।
৫. আহমাদ আলী সাহারানপুরী, মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩।
৬. ফাৎহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫।
৭. আল-জামেউস সাহীহ লিল বুখারী (বঙ্গানুবাদ) অনুবাদকঃ অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, (ঢাকাঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট ১৯৯৮/১৪১৮ হিঃ) ১ম খণ্ড, ভূমিকা অধ্যায়, পৃঃ ঢ।
৮. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮০/১৪০০ হিঃ), পৃঃ ৫২২।
৯. আল-জামেউস সাহীহ লিল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ঢ।
১০. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩১।
১১. আল-জামেউস সাহীহ লিল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ঢ।
১২. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৫২৫।
১৩. মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪।

হাদীছ গ্রন্থ সংকলনে উদ্বুদ্ধ করে'।[১৪]

দ্বিতীয় কারণঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, একদা আমরা কয়েকজন ছাত্র উস্তাদ ইসহাক বিন রাহওয়াই-এর নিকট ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন,

لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبى صلى الله عليه وسلم- فوقع ذلك فى قلبى فأخذت فى جمع هذا الكتاب-

'যদি তোমাদের কেউ এমন একটি হাদীছ গ্রন্থ রচনা করতে যাতে শুধুমাত্র ছহীহ হাদীছ সমূহই সন্নিবেশিত হবে, তাহ'লে কতই না ভাল হ'ত'! ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, 'এ কথাগুলি আমার হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে। অতঃপর আমি ছহীহ বুখারী সংকলন শুরু করলাম'।[১৫]

কিতাবের নামঃ

ছহীহ বুখারীর পুরো নাম হ'ল-

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه-

'আল-জামেউল মুসনাদুছ ছহীহুল মুখ্তাছার মিন উমূরে রাসূলিল্লা-হি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়ামিহী'।[১৬]

ছহীহ বুখারী সংকলনঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ) সুদীর্ঘ ১৬ বছর কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করে ছহীহ বুখারী সংকলন করেছেন।[১৭]

তিনি প্রতিটি হাদীছ লিপিবদ্ধ করার সময় গোসল করে দু'রাক'আত ইস্তেখারার ছালাত আদায় করে হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে লিপিবদ্ধ করতেন।[১৮]

তিনি ছহীহ বুখারীর বাব (অধ্যায়) সংযোজন করেছেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পবিত্র কবর ও মসজিদে নববীর মাঝখানে বসে। তিনি প্রতিটি বাব লেখার সময়ও দু'রাক'আত করে ছালাত আদায় করতেন।[১৯]

আবার কারো মতে মক্কায় বসে বাব সংযোজন করেছেন।[২০]

তাঁর সংগ্রহে ছয় লক্ষ হাদীছ ছিল।[২১] তার মধ্য থেকে যাচাই-বাছাই করে বিশুদ্ধ সাত হাযার দু'শত পচাত্তর খানা হাদীছ স্বীয় কিতাবে সন্নিবেশিত করেছেন। তাকরার হাদীছ বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে চার হাযার হাদীছ।[২২] হাদীছ সংগ্রহের জন্য ইমাম বুখারী (রহঃ) মক্কা, বছরা, কূফা, বাল্‌খ, বাগদাদ, আসক্বালান, হিমস, দামেশক প্রভৃতি দেশের মুহাদ্দিছগণের দারস্থ হয়েছেন।[২৩] তিনি সিরিয়া, মিসর ও জাযীরায় দু'দু'বার, বছরায় চারবার, হিজাযে ক্রমাগত ছয় বছর অবস্থান করেছেন। আর কূফা ও বাগদাদে যে কতবার গমন করেছেন তা গণনা করা যায় না।[২৪]

ছহীহ বুখারীর সত্যায়নঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীর পাণ্ডুলিপি আলী ইবনুল মাদীনী, ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুঈন, আহমাদ ইবনু হাম্বল প্রমুখ সমকালীন জগদ্বিখ্যাত মহামনীষীদেরকে যাচাই করতে দেন। তাঁরা উছূলে হাদীছের মানদণ্ডে যাচাই করে মাত্র চার খানা হাদীছ ব্যতীত সমস্ত হাদীছের বিশুদ্ধতার উপর ঐক্যমত পোষণ করেন। ঐ চারখানা হাদীছ সম্পর্কে তাঁরা ভিন্নমত পোষণ করেন।

অবশ্য ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শর্তে ঐ চারটি হাদীছও ছহীহ।[২৫] সমকালীন বিশ্বের সমস্ত মুহাদ্দিছগণ এ গ্রন্থের চুলচেরা বিচার-বিবেচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আলোচনা-সমালোচনা এবং পর্যালোচনা করে সর্বসম্মত ভাবে এ গ্রন্থটিকে أصح الكتاب بعد كتاب الله অর্থাৎ 'মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও নির্ভুল গ্রন্থ' হিসাবে স্বীকৃতি দান করেছেন।[২৬] আল্লামা মহিউদ্দীন ইয়াহইয়া বলেন, 'এ বিষয়ে পূর্ব-পশ্চিমের ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পরে বিশুদ্ধতম কিতাব হ'ল দু'টি- ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম'।[২৭] আর ছহীহ বুখারী হ'ল এ দু'টোর মাঝে বিশুদ্ধতম।[২৮] ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন,

لم أخرج فى هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح اكثر-

'আমি এ কিতাবে ছহীহ ছাড়া কোন হাদীছ সন্নিবেশিত করিনি। (কিতাবের পরিধি বৃদ্ধি পাবে বিধায়) অনেক ছহীহ হাদীছও সন্নিবেশিত করিনি'।[২৯]

---

১৪. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, মুক্বাদ্দামাহ ফাৎহুল বারী (কায়রোঃ দারুর রাইয়ান লিত-তুরাছ ১৯৮৬/১৪০৭ হিঃ) পৃঃ ৯; মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী লি সাহারানপুরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪।*
১৫. *তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩১, মুক্বাদ্দামা ফাৎহুল বারী, পৃঃ ৯।*
১৬. *মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪।*
১৭. *ফাৎহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬।*
১৮. *আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী (বৈরুতঃ এহইয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, তাঃবিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫; তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩১।*
১৯. *মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪।*
২০. *ফাৎহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬।*
২১. *মুক্বাদ্দামাহ ফাৎহুল বারী, পৃঃ ৯।*
২২. *উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬।*
২৩. *হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৫২৪।*
২৪. *ঐ, পৃঃ ৫২৪।*
২৫. *তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪; মুক্বাদ্দামাহ ফাৎহুল বারী, পৃঃ ৯।*
২৬. *আল-জামেউস সাহীহ লিল বুখারী, পৃঃ ধ।*
২৭. *উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫।*
২৮. *ফাৎহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬।*
২৯. *মুক্বাদ্দামাহ ফাৎহুল বারী, পৃঃ ৯।*

বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থঃ

ওলামায়ে দ্বীনের নিকটে এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, ছহীহ বুখারীর এত অধিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণীত হয়েছে যে, অন্যান্য সমস্ত হাদীছের ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমষ্টিগত ভাবেও তার সমান হবে না। 'কাশ্‌ফুয যুনূন' প্রণেতা স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন যে, ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ বিরাশি খানা।[৩০] তন্মধ্যে নিম্নের দশখানা প্রসিদ্ধ -

(১) ফাৎহুল বারী লি ইবনে হাজার আসক্বালানী।
(২) উমদাতুল ক্বারী লি বদরুদ্দীন আইনী।
(৩) ইরশাদুস সারী লি আবিল আব্বাস আহমাদ বিন মুহাম্মাদ কুস্তুলানী।
(৪) তুহ্‌ফাতুল বারী লি যাকারিয়া আনছারী।
(৫) আল-কাওয়াকেবুদ দিরারী লি শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ কিরমানী।[৩১]
(৬) খায়রুল জারী লিশ শায়েখ ইয়াকূব আল-বামবানী।
(৭) আত-তানক্বীহ লিশ শায়েখ বদরুদ্দীন যারকাশী।
(৮) আত-তাওশীহ লিশ শায়েখ জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী।
(৯) আল-ওছমানী।
(১০) ফায়যুল বারী।[৩২]

ইমাম বুখারী (রহঃ) রচিত অন্যান্য গ্রন্থাবলীঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারী ছাড়াও আরো অনেক মূল্যবান কিতাব রচনা করেছেন। নিম্নে প্রসিদ্ধ কয়েকটি কিতাবের নাম দেয়া হ'লঃ-

(১) তারীখুল কাবীর (২) তারীখুছ ছাগীর (৩) তারীখুল আওসাত (৪) মুসনাদে কাবীর (৫) তাফসীরে কাবীর (৬) আসমায়ে ছাহাবা (৭) কিতাবুয যাওয়ায়েদ।[৩৩] (৮) আদাবুল মুফরাদ (৯) রাফ'উল ইয়াদাইন ফিছ ছালাত (১০) ক্বিরাআতু খালফাল ইমাম (১১) বিররুল ওয়ালেদাইন (১২) খালকু আফ'আলে ইবাদ (১৩) কিতাবুয যু'আফা (১৪) আল-জামেউল কাবীর (১৫) কিতাবুল আশ্‌রিবাহ (১৬) কিতাবুল হিবা (১৭) কিতাবুল মাবসূত ইত্যাদি।[৩৪]

অধিকারী ইমাম বুখারী তীক্ষ্ণ মেধার দৃষ্টান্তঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর বাল্যকালের ঘটনা। তখন তিনি মাত্র দশ বছরের বালক। এ সময় তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ইমাম দাখিলীর শিক্ষায়তনে পাঠ গ্রহণ করছিলেন। মুহাদ্দিছ দাখিলী একদা একটি হাদীছ পড়ে শুনালেন। এ হাদীছের সনদে سفيان عن أبى الزبير عن ابراهيم রয়েছে। বালক বুখারী (রহঃ) প্রতিবাদ করে বললেন, আবু যুবাইর ইবরাহীম থেকে হাদীছ বর্ণনা করেননি। মুহাদ্দিছ দাখিলী তাঁকে ধমক দিলেও তিনি প্রশান্ত চিত্তে বললেন, ابو الزبيرعن ابراهيم নয়, বরং زبيربن عدى عن ابراهيم। মেহেরবানী করে আপনার মূল পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখুন। অতিরিক্ত জোর দেয়ায় উস্তাযের মনে সংশয় দেখা দিল। তিনি পাণ্ডুলিপি দেখে এসে বললেন, তোমার কথাই ঠিক। মুহাদ্দিছ দাখিলী তাঁর জন্য প্রাণ খুলে দো'আ করলেন।[৩৫]

ইমাম বুখারী (রহঃ) যখন বাগদাদে গেলেন তখন সেখানকার মুহাদ্দিছগণ তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য দশজন লোককে একশত হাদীছ সনদ-মতন উলট পালট করে শিখালেন। হাদীছ পর্যালোচনা বৈঠকে সেই দশজন ক্রমান্বয়ে হাদীছ পড়ে শুনালেন।

এক একজন হাদীছ পড়ে শুনানোর পর ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে সে হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি জবাবে বলেন, এমন হাদীছ আমার জানা নেই। এভাবে দশজন হাদীছ শুনানোর পর ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রথম জনকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি যে হাদীছ বলেছেন সেটি ওভাবে না হয়ে এভাবে হবে। অতঃপর দ্বিতীয় জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি যে হাদীছ বলেছেন সেটা এভাবে হবে। এভাবে দশজনের প্রত্যেকের হাদীছ সংশোধন করে দিলেন। তাঁর এ অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি দেখে সকলেই বিস্মিত হ'লেন এবং তাঁকে 'অপরাজেয় হাফেযে হাদীছ' রূপে স্বীকৃতি দিলেন।[৩৬] তিনি এক লক্ষ ছহীহ ও দু'লক্ষাধিক গায়রে ছহীহ হাদীছের হাফেয ছিলেন।[৩৭]

অন্যান্য মনীষীদের দৃষ্টিতে ইমাম বুখারী (রহঃ)ঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর অসাধারণ দীপ্ত প্রতিভা, হাদীছ সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাইয়ের সুনিপুণ তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতার জন্য প্রায় সমস্ত মুহাদ্দিছ ও মহামনীষীগণ তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীছ সংকলক মুহাদ্দিছ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

মুহাদ্দিছ ইবনু খুযায়মা বলেন-

ما رأيت تحت اديم السماء اعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احفظ له من البخارى-

৩০. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৫৪৯।
৩১. ফাৎহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬।
৩২. মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১।
৩৩. আল-জামেউস সাহীহ লিল বুখারী, পৃঃ ণ।
৩৪. মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪।
৩৫. আল-জামেউস সাহীহ লিল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ণ।
৩৬. মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪।
৩৭. মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩।

'আসমানের নীচে ইমাম বুখারী (রহঃ) অপেক্ষা বড় ও শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও হাফেযে হাদীছ আর কাউকে দেখিনি'।[৩৮]

আহমাদ ইবনে হামদুন বলেন- جاء مسلم بن الحجاج إلى البخارى فقبل بين عينه وقال دعنى اقبل رجليك يا استاذ الاستاذين ويا سيد المحدثين وياطبيب الحديث فى علله-

'ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নিকট এসে তাঁর ললাটে চুম্বন করে বলেন, হে সমস্ত ওস্তাযের ওস্তায! হে মুহাদ্দিছকূল শিরোমণি ও হাদীছের (সনদের ব্যাধি ও মতনের নিগূঢ় রহস্য উন্মোচনকারী) ডাক্তার! আমাকে আপনার পদযুগল চুম্বন করার অনুমতি দিন'![৩৯]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবী হাতিম বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে পিছনে চলছেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে স্থানে পা ফেলছেন, তিনিও ঠিক তাঁর পদচিহ্নে পা ফেলে চলেছেন।[৪০] উক্ত স্বপ্ন থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের যথাযথ ধারক ও বাহক।

ইবনে আকরাম বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, আমি মুসলিম ইবনে হাজ্জাজকে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নিকটে বসে একজন বালক ছাত্রের ন্যায় তাঁকে প্রশ্ন করতে দেখেছি।[৪১]

আবু আব্দুল্লাহ ইবনে আকরামকে জনৈক লোক ইমাম বুখারী (রহঃ) সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) তোমার-আমার চেয়ে এমনকি ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজের চেয়েও জ্ঞানী। ইমাম বুখারী (রহঃ) যখন নিশাপুর থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া যাহাবী বলেন, 'হে লোক সকল! তোমরা এই সৎ লোকটির নিকট যাও এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ কর। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান দারেমী বলেন, 'আমি মক্কা-মদীনা, কূফা ও বছরাতে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর চেয়ে অধিক হাদীছ সংকলক আর দেখিনি'।[৪২]

মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার বলেন, 'এ পৃথিবীতে হাদীছের হাফেয চারজন- মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান দারেমী, মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী ও রায়-এর আবু যুর'আ।[৪৩]

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ইমাম বুখারীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে আবু আব্দুল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে প্রেরণ করে এ উম্মাতকে সুশোভিত করেছেন। আমি আপনার মত এমন সুক্ষ্মভাবে হাদীছের সনদ যাচাই করতে আর কাউকেই দেখিনি'।[৪৪]

ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়াই ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে দেখিয়ে দিয়ে বলেন, 'হে হাদীছের অনুসারীগণ! তোমরা এই যুবকের দিকে তাকিয়ে দেখ এবং তাঁর নিকট থেকে তোমরা হাদীছ লিখে নাও, যদি তিনি হাসান বছরীর যামানায়ও থাকতেন তবুও লোকেরা ইলমে হাদীছ ও ইলমে ফিক্বহের জন্য তাঁর (বুখারীর) প্রয়োজন অনুভব করত'।[৪৫]

শেষ জীবনঃ

এ দুনিয়াবী জীবন কারও জন্য কুসুমাস্তীর্ণ, নিষ্কন্টক নয়। বিশেষ করে ভাল কাজের অন্তরায় সৃষ্টি হয়ই। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর জীবনেও এ কঠিন বাস্তবতা নেমে আসে। তিনি যখন ইলমে হাদীছ চর্চায় মশগূল, এমন সময় তৎকালীন বুখারার শাসনকর্তা খালিদ ইবনে আহমাদ আয-যাহবী ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নিকট লোক মারফত নির্দেশ পাঠান যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) যেন তাঁর রাজ প্রাসাদে এসে তাঁর সন্তানদেরকে ইলমে হাদীছ ও ইতিহাস শিক্ষা দেন এবং সেখানে অন্য কোন ছাত্র থাকতে পারবে না। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ) শাসনকর্তার আদেশ পালন করতে অস্বীকার করেন এবং বলে পাঠালেন যে, এই কিতাব আমি কিছু লোককে পড়ে শুনাব আর কিছু লোককে শুনাব না তা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় হ'তে পারে না।[৪৬] হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, فكان سبب الوحشة بينهما هذا-

'ইহাই ইমাম বুখারী ও শাসনকর্তার মধ্যে দূরত্ব ও মনমালিন্য সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়'।[৪৭] শাসনকর্তা ইমামের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। তিনি ইমামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার লক্ষ্যে তার কিছু সংখ্যক পা চাটা বিদ্বান নিযুক্ত করেন। বলা বাহুল্য যে, ষড়যন্ত্রকারীদের পরিণামও একান্তই মর্মান্তিক হয়েছিল। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম বুখারী জন্মভূমি বুখারা ত্যাগ করে নিশাপুরে চলে যান।[৪৮]

ইন্তেকালঃ

নিশাপুরেও অনুরূপ ঘটনার অবতারণা হ'লে তিনি সমরকন্দের নিকটবর্তী খরতঙ্গে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বসবাস শুরু করেন। তিনি পার্থিব জগতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ

---

৩৮. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩।
৩৯. মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩।
৪০. মুক্বাদ্দামাহ ফাৎহুল বারী, পৃঃ ৯।
৪১. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩।
৪২. ঐ, পৃঃ ৩৩।
৪৩. মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩।
৪৪. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩।
৪৫. মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩।
৪৬. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩২।
৪৭. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৫২৮।
৪৮. আল-জামেউস সাহীহ লিল বুখারী, পৃঃ ত।

হয়ে একদা রাত্রে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেন-

اللهم إنه قد ضاقت على الأرض بما رحبت فاقبضنى إليك-

'হে আল্লাহ! এ বিস্তৃত পৃথিবী আমার জন্য একেবারেই সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে।, অতএব আপনি আমাকে আপনার নিকট উঠিয়ে নিন'।[৪৯] রাব্বুল আলামীন তাঁর এ মাহবূব বান্দার প্রার্থনা কবুল করলেন। এর মাত্র কয়েকদিন পর ২৫৬ হিজরীর ঈদুল ফিতরের পূর্ব রাতে হাদীছ শাস্ত্রের এ উজ্জ্বল জোতিষ্ককে তাঁর দিকে উঠিয়ে নেন।[৫০] মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর ১৩ দিন। ঈদুল ফিতরের দিন যোহর ছালাতের পর তাঁকে দাফন করা হয়।

ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে দাফন করার পর তাঁর কবর থেকে মৃগণাভীর সুগন্ধির ন্যায় সুঘ্রাণ বের হ'তে থাকে, এতে মানুষ খুবই আশ্চার্যান্বিত হয় ও দলে দলে লোক এসে তাঁর কবর থেকে সুঘ্রাণযুক্ত মাটি নিতে থাকে। (পরে বাদশার হস্তক্ষেপে মাটি নেয়া বন্ধ করে দেয়া হয়)। জনৈক লোক বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদল ছাহাবীসহ দাঁড়িয়ে আছেন, আমি তাঁকে সালাম দিলাম অতঃপর তিনি সালামের জবাব দিলেন। অতঃপর আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। অতঃপর পরের দিন যখন ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ আমার নিকট পৌঁছল, তখন আমি অনুমান করে দেখলাম, ঠিক আমার স্বপ্ন দেখার সময়ই ইমাম বুখারী (রহঃ) ইন্তেকাল করেছেন।[৫১]

হে আল্লাহ! তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন- আমীন!!

৪৯. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩।
৫০. মুক্বাদ্দামাহ ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩।

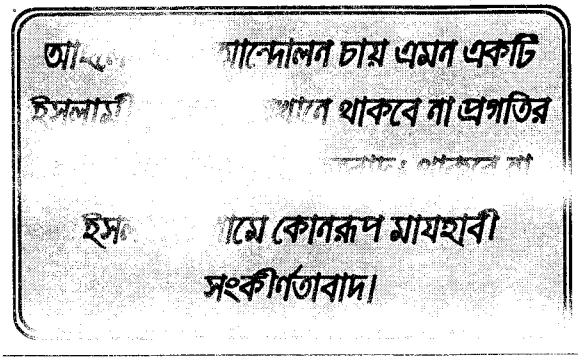

নবীনদের পাতা

মায়ের দুধ ও অন্যান্য দুধঃ কুরআন, সুন্নাহ ও আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে

*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাশীর**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চতুষ্পদ জন্তুর দুধ সম্পর্কে আলোচনাঃ

চতুষ্পদ জন্তুর দুধ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّ لَكُمْ فِى الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِى بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّرِبِينَ-

'তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুদের মাঝে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তু সমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুধ, যা পানকারীদের জন্য উপাদেয় *(নাহল ৬৬)*। অনুরূপভাবে আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন, 'এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পান করাই এবং তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে প্রচুর উপকারিতা আছে। তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণ কর' *(মুমিনূন ২১)*। গোবর ও রক্তের মাঝখান দিয়ে পরিষ্কার দুধ বের করা সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'জন্তুর ভক্ষিত ঘাস তার পাকস্থলীতে একত্রিত হ'লে পাকস্থলী তা সিদ্ধ করে। পাকস্থলীর ক্রিয়ার ফলে খাদ্যের বিষ্ঠা নীচে বসে যায় এবং দুধ উপরে থেকে যায়। দুধের উপরে থাকে রক্ত। এর পর যকৃত এই তিনপ্রকার বস্তুকে পৃথকভাবে তাদের স্থানে ভাগ করে দেয়, রক্ত পৃথক হয়ে রগের মধ্যে চলে যায় এবং দুধ পৃথক করে জন্তুর স্তনে পৌঁছে দেয়। এখন পাকস্থলীতে শুধু বিষ্ঠা থেকে যায়। যা গোবর হয়ে বের হয়ে আসে'।[২০]

দুধ যে সব উপাদানে তৈরী, সে সব উপাদান নিঃসৃত হয় 'মামারীগ্ল্যাণ্ড' নামক অবস্থিত একটি রসস্রাবী গ্রন্থি থেকে। 'মামারীগ্ল্যাণ্ড' পরিপুষ্টতা পায় খাদ্যের সেই সারবস্তু থেকে, যে সারবস্তু বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও রূপান্তরের মাধ্যমে রক্ত ধারার সহায়তায় 'মামারীগ্ল্যাণ্ডে' পৌঁছায়। সুতরাং যা কিছু খাদ্যবস্তু থেকে পাওয়া যায়, একমাত্র রক্তই সেসব কিছুর সংগ্রাহক এবং নিয়ামক হিসাবে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। এভাবে এই রক্তই দেহের অন্যান্য যন্ত্রের মত 'মামারীগ্ল্যাণ্ডের'ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি সাধন করে। আর এই

* আলিম ১ম বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
২০. মূলঃ মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী (রহঃ), অনুবাদঃ মাওলানা মহিউদ্দীন খান, তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন (সংক্ষিপ্ত), পৃঃ ৭৪৬; বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন সুন্নাহ, পৃঃ ২৮।

প্রক্রিয়ায় রক্ত ও অন্ত্রের রাসায়নিক বস্তু সম্মিলিতভাবে 'মামারীগ্ল্যাণ্ডে' তৈরী করে থাকে দুধ উৎপাদনের উপাদান।[২১] আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কুদরত যা চতুষ্পদ জীব-জন্তুর উদরস্থিত রক্ত ও আবর্জনা জঞ্জালের মলিনতা থেকে পৃথক করে মানুষের জন্য স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন খাদ্য আকারে প্রদান করেছেন, যার প্রস্তুতিতে মানুষের নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় না। অথচ তা উপকারী ও সুস্বাদু। মানুষ তা আগ্রহ সহকারে পান করে থাকে। রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয় খাদ্যগুলির মধ্যে একটি ছিল দুধ। যেমন- আনাস (রাঃ) বলেন, 'আমি আমার পিয়ালা দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে বিভিন্ন ধরনের পানীয় পান করাতাম। যেমন- মধু, নাবীল ও দুধ'।[২২]

চিন্তা-গবেষণার বিষয়ঃ

মানুষ যেমন আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, পশুও তেমনি তাঁরই সৃষ্টি। মর্যাদা হিসাবে মানুষ ও পশুর মাঝে বিরাট ব্যবধান থাকলেও সৃষ্টি হিসাবে মানুষ ও জন্তু আল্লাহ্‌র কাছে গুরুত্বপূর্ণ। জন্তুর দুধ মানুষের খাদ্য হিসাবে নির্বাচিত করার মাঝে রয়েছে এক অলৌকিক দর্শন। এক সৃষ্টির প্রতি আরেক সৃষ্টির মহব্বত ও মমত্ববোধ তৈরী করার এ যে অভূতপূর্ব কৌশল। এখানে নিহিত রয়েছে 'হক্কুল-ইবাদ' বা বান্দার হক-এর গূঢ় রহস্য। চতুষ্পদ জন্তুদের মাঝে চিন্তা করার যে অবকাশ রয়েছে বলে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন, এটি তার একটি নিদর্শন।[২৩]

সত্যিই আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর দুধ পানের বিধান দানের মাঝে এমন এক হিকমত প্রদান করলেন যে, উভয় সৃষ্টির মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি ভাব সর্বদা প্রতিফলিত হ'তে থাকবে।

সৃষ্টির প্রতি দয়াপরবশ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দয়াবান ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহ রহমানুর রহীম দয়া করেন। অতএব তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া কর। আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন'।[২৪] চতুষ্পদ জন্তুর স্তন হ'তে দুধ আহরিত হয়। এখানেও মানুষের জন্য চিন্তা করার যথেষ্ট খোরাক আছে। চতুষ্পদ জন্তুরা ঘাস-লতা-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে। ঘাস আর লতা-পাতাকে বেটে রস বের করলে তা থেকে এক ফোঁটা দুধও তৈরী করা যাবে না। যেটুকু খাদ্য খেয়ে চতুষ্পদ জন্তু যে পরিমাণ দুধ সরবরাহ করে, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সে বস্তু থেকে তার এক দশমাংশ দুধ কোন মতেই উৎপাদন করা সম্ভব নয়। শুধু খাদ্য খেলেই দুধ তৈরী হয় এমন নয়। খাদ্য না খেলেও চতুষ্পদ জন্তুর স্তন থেকে দুধ পাওয়া যায়।[২৫] আল্লাহ্‌র কি অসীম কুদরত মানুষ ও পশুকে সাদা, কালো, লাল ইত্যাদি এবং ভাত, পানি, ডাল, মাছ, গোশত আর পশুকে, ঘাস, খড়, পানি ইত্যাদি বিভিন্ন রং ও বিভিন্ন ধরনের খাদ্য খাওয়ায়ে স্রেফ বিশুদ্ধ ধবধবে সাদা দুধ তৈরী করেন। যিনি এর প্রস্তুতকারক তিনিইতো বিশ্ব জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও নিপুণ কারিগর। তার তুলনা হয় না। তিনি উপমার ঊর্ধ্বে।

গরুর দুধঃ

গরুর দুধ হালকা সাদা। গরুর দুধে জলীয়াংশ থাকে ১০০ গ্রামে ৮৭.৫ গ্রাম, আমিষ[২৬] থাকে ৩.২ গ্রাম। গরুর দুধে চর্বি[২৭] পরিমাণ থাকে ৪.১ গ্রাম ও খনিজ ০.৮ গ্রাম। খনিজ দেহ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ক্যালোরীর পরিমাণ ৬৭। ক্যালোরী হচ্ছে শক্তির একক। ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ১২০ মিলিগ্রাম। ফসফরাসের পরিমাণ ৯০ মিলিগ্রাম। ক্যারটিন ৪৯৭ মাইক্রোগ্রাম থাকে।[২৮]

ছাগলের দুধঃ

রাসূল (ছাঃ) বকরীর দুধ পান করতে পসন্দ করতেন। রাসূল (ছাঃ) একদা এক আনছারী ছাহাবীর বাড়ীতে বকরীর দুধ পান করেন।[২৯] হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, 'একদা রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য একটি গৃহপালিত বকরীর দুধ দোহন করা হ'ল এবং তাতে কূপের পানি মিশানো হ'ল। অতঃপর উহা রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে পেশ করা হ'লে, তিনি তা পান করলেন'।[৩০]

বকরীর দুধের গুরুত্ব অনেক। আমেরিকার প্রসিদ্ধ খাদ্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ডগ্লাস থামস তার অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, বকরীর দুধ অন্যান্য পানীয় জিনিষের তুলনায় উত্তম এবং উপকারী। এর প্রাধান্যের দু'টি বিশেষ কারণ এই যে, প্রথমতঃ বকরীর মধ্যে ক্ষয় জ্বর হয় না, যা সাধারণত গাভীর মধ্যে হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ তুলনামূলকভাবে ইহা দ্রুত হজম হয়।[৩১]

ছাগলের দুধে জলীয়াংশ থাকে ১০০ গ্রামে ৮৬.৮ গ্রাম, আমিষ থাকে ৩.৩ গ্রাম, চর্বি থাকে ৪.৫ গ্রাম, খনিজ থাকে ০.৮ গ্রাম ও শর্করা জাতীয় পদার্থ থাকে ৪.৬ গ্রাম। ক্যালোরীর পরিমাণ ৭২। ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ১৭০ মিলিগ্রাম। ফসফরাসের পরিমাণ ১২০ মিলিগ্রাম। ক্যারটিন থাকে ১২৮ মাইক্রোগ্রাম।[৩২]

---

২১. মুহাম্মদ শাহজাহান খান, কোরআন এক বিস্ময়কর বিজ্ঞান (ঢাকাঃ সুলেখা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী, ২০০০), পৃঃ ১৩৯।
২২. মুসলিম, গৃহীতঃ ওয়ালিউদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-খত্বীব আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাছাবীহ (ঢাকাঃ ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, তাবি), পৃঃ ৩৭২।
২৩. মাসিক 'অগ্রপথিক', ঢাকাঃ ১২ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, পৃঃ ৪৭; বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন সুন্নাহ, পৃঃ ২৮।
২৪. আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত, পৃঃ ৪২৩।
২৫. বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন সুন্নাহ, পৃঃ ২৮।
২৬. আমিষ মানবদেহের ক্ষয় পূরণ করে বৃদ্ধি ঘটায়, পুষ্টি সাধন করে, জারক রস, হরমোন, কিছু শক্তি ও তাপ উৎপাদনে সহায়তা করে। রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণ করে, রক্ত জমাট বাধতে সাহায্য করে, মাংসপেশী গঠন করে। আমিষের উদ্বৃত্ত অংশ শর্করা বা চর্বিতে রূপান্তরিত হ'তে পারে। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ২৯; মাসিক 'অগ্রপথিক', পৃঃ ৪৮।
২৭. চর্বি মানব শরীরে শক্তি ও তাপ উৎপাদন করে। চর্মের কমলতা ও মাংসের নমনীয়তা রক্ষা করে। চর্মের ও মাংসের মেদ বৃদ্ধি করে ও শরীরের গঠনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। দ্র. তদেব।
২৮. তদেব, পৃঃ ৪৮-৪৯।
২৯. বুখারী, মিশকাত, পৃঃ ৩৭০।
৩০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, পৃঃ ৩৭০।
৩১. সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ৩৬৯।
৩২. অগ্রপথিক, পৃঃ ৪৮-৪৯; বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন সুন্নাহ, পৃঃ ২৯-৩০।

ছাগলের দুধের ভূয়সী প্রশংসা করে ডাক্তার মেরিপট বলেন, 'যখন গরুর দুধ বাচ্চাদের হজম না হয় বরং বদহজমী এবং পেট খারাপ হয়, তখন বাচ্চাদেরকে বকরীর দুধ পান করানো খুবই উপকারী ও যরূরী। এরূপ বাচ্চারা বকরীর দুধ খুব তাড়াতড়ি হজম করে নেয়।[৩৩] বকরীর দুধে ফ্লোরিন খুব বেশী থাকে, ইহা হাড্ডি বর্ধক। দাঁত মযবূত কারক এবং চোখের যত্নে খুবই উপকারী। ম্যাগনেশিয়াম মেরুদণ্ডকে মযবূত করে। এ ম্যাগনেশিয়ামও বকরীর দুধে বেশী থাকে। বকরীর দুধে সোডিয়ামের পরিমাণ খুব বেশী। এছাড়া এর মধ্যে অনেক ভিটামিনও আছে।[৩৪]

মহিষের দুধঃ

মহিষের দুধে জলীয়াংশ থাকে প্রতি ১০০ গ্রামে ৮১ গ্রাম, আমিষ থাকে ৪.৩ গ্রাম, চর্বির পরিমাণ ৮.৮ গ্রাম, খনিজ পদার্থ থাকে ০.৮ গ্রাম ও শর্করা জাতীয় পদার্থ থাকে ৫ গ্রাম। ক্যালোরীর পরিমাণ ১১৭। ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ১২০ মিলিগ্রাম। ফসফরাসের পরিমাণ ১৩০ মিলিগ্রাম। ক্যারটিনের পরিমাণ ১৬০ মাইক্রোগ্রাম।[৩৫]

দুধের উপকারিতাঃ

সকল দুধেরই সাধারণ গুণ হচ্ছে- বলবর্ধক, আয়ূবর্ধক, মেধাবর্ধক, স্মৃতিশক্তিবর্ধক, ক্লান্তি, নিদ্রাকারক এবং ত্রিদোষ নাশক। গরুর দুধ বাত, পিত্ত, রক্তদোষ, হৃদরোগ, বেরিবেরি ও ন্যাফ্রাইটিস রোগের উপকার করে।[৩৬] বকরীর দুধ খুব ঠাণ্ডা ও সুস্বাদু হয়। জঙ্গলে বিচরণকারী বকরীর দুধ বেশী উপকারী মনে করা হয়। ইহা কাশি, দাস্ত, আমাশয়, ক্ষয়জ্বর, হৃদরোগ, পুরাতন জ্বর, জণ্ডিস, অর্শরোগ, মস্তিষ্ক ও ব্লাডের যথেষ্ট উপকারী। বকরীর দুধে বানরের কাঠি এবং খয়ের মিলিয়ে গরগরা করলে মুখের ঘা ভাল হয়ে যায়। বকরীর দুধে তুলা ভিজিয়ে রাত্রি বেলা চোখের উপর রেখে পট্টি বেঁধে ঘুমালে চোখের ব্যথায় উপকার পাওয়া যায়।[৩৭] মহিষের দুধ রক্তপিণ্ড ও দাহনাশ করে।[৩৮] দুধ থেকেই তৈরী হয় ঘি এবং ঘি শরীরে চর্বি সরবরাহের এক শ্রেষ্ঠ উৎস। চতুষ্পদ জন্তুর দুধ থেকে তৈরী সকল ঘি-ই দেহের দৃঢ়তা বাড়ায়, শীত নাশ করে, বল বাড়ায়, কাশি, সৌকুমার্য বৃদ্ধিসহ স্মৃতিশক্তি বর্ধিত করে। রক্তপিত্তে, নেত্ররোগে, শুক্ররোগে ঘি বিশেষ ব্যাথা-বেদনা ও পুরনো সর্দির উপশম হয়।[৩৯]

আবার দুধ থেকেই তৈরী ঘোল ত্রিদোষ নাশক, রুচিবর্ধক, শ্রান্তি-ক্লান্তি হরণকারক, বমন, অতিসার, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, কলেরা, বাত, জ্বর, ন্যাবা, প্রমেহ, উদর ও কোষ্ট সংক্রান্ত রোগের বিশেষ উপকারী।[৪০] মোটকথা দুধ মানব জীবনে বহু উপকারী পানীয়। আর এ জন্যই আল্লাহ বলেন, 'যা পানকারীদের জন্য উপাদেয়' *(নাহল ৬৬)*। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে দুধের মত উপাদেয় খাদ্য আর দ্বিতীয়টি নেই। দুধ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদ্য। তাই দুধকে বলা হয় 'আদর্শ খাদ্য'।[৪১]

এক বিস্ময়কর দুগ্ধ বৃক্ষঃ

উত্তর আমেরিকায় একটি গাছ দেখা যায়। এই গাছের গায়ে ছিদ্র করলে দুধ বের হয়ে আসে, যা খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু। এ গাছের ছাল দিয়ে সুমিষ্ট রুটি তৈরী করা যায়। এই গাছ থেকে রুটি ও দুধ উভয়ই মিলে।[৪২] সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে যে, গাছটি ছিদ্র করলেই দুধের সন্ধান মেলে। যা পান করতে খুব সুস্বাদু। তাহ'লে কোন্ স্রষ্টা এর প্রস্তুত কারক? কোন্ শিল্পী তাঁর শৈল্পিক পদ্ধতিতে এত নিঁখুত ও নিপুণভাবে এ ধরিত্রীকে সাজিয়েছেন। যিনি বৃক্ষের মাঝেও দুধের সঞ্চার করেছেন! তিনিই তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ। খুঁজে দেখি তিনি তাঁর পাক কালাম মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এ সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন কি-না? তিনি বলেন, 'এবং ঐ বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা সিনায় পর্বতে জন্মায় এবং আহারকারীদের জন্য তৈল ও ব্যাঞ্জণ উৎপন্ন করে' *(মুমিনূন ২০)*। অনেকে আবার এ আয়াতের অনুবাদ এভাবে করেছেন।[৪৩] 'এবং সিনাই পাহাড়ের মধ্য হ'তে এমন এক বৃক্ষ সৃজন করেছি, যা হ'তে তৈল উৎপন্ন হয় এবং ভক্ষণকারীদের জন্য সুস্বাদু তরকারিও প্রস্তুত হয়'।

সমাপনীঃ

সর্বোপরি কথা এই যে, দুধ যারই হোক চাই মায়ের অথবা চতুষ্পদ জন্তুর তা খুবই পুষ্টিকর পানীয়। দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্য মায়ের দুধ খুবই উপকারী। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কুরআনী শিক্ষার উপর আমল করলে অনেক পারিবারিক বিষয় যেমন অর্থনীতি সহ অন্যান্য বেশ সমস্যার সমাধান হয় এবং বাচ্চা কুদরতী খাদ্য খেয়ে প্রতিপালিত হয়ে সুস্বাস্থ্য সম্মত জীবন যাপন করে। অপরপক্ষে বাচ্চাও কৃত্রিম বা বাহিরের দুধের বিষাক্ত ছোবলের প্রভাব থেকে নিরাপদে থাকে। আবার প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য আল্লাহ চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে দুধের সঞ্চার করেছেন। যা তাঁর বান্দা পান করতে পারে তৃপ্তি সহকারে। সাথে সাথে গবেষণার এক বিশাল রাজ্য সেখানে রেখে দিলেন মানুষের জন্য। কুরআন যে দুধের প্রশংসা করেছে, সে দুধ প্রকৃতপক্ষেই মানুষের প্রভূত কল্যাণ সাধন করে, ইহা আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ ও নে'মত। কুরআনের কথার সত্যতা বিজ্ঞানেও স্বীকৃত। ফলে এ কথা পূর্ণিমার শশীর ন্যায় স্পষ্ট যে, দুধ প্রসঙ্গে বিজ্ঞান কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্র বাণীরই সত্যতার প্রতিধ্বনি করে মাত্র।

[সমাপ্ত]

---

৩৩. সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ৩৬৯।
৩৪. তদেব, পৃঃ ৩৭০।
৩৫. অগ্রপথিক, পৃঃ ৪৮-৪৯; বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন সুন্নাহ, পৃঃ ২৯-৩০।
৩৬. তদেব।
৩৭. সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ৩৭০-৩৭১।
৩৮. অগ্রপথিক, পৃঃ ৪৯।
৩৯. তদেব; বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন সুন্নাহ, পৃঃ ৩১।
৪০. তদেব।
৪১. তদেব, পৃঃ ২৯; অগ্রপথিক, পৃঃ ৪৮।
৪২. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, বিজ্ঞান না কোরআন (কলিকাতাঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ৪র্থ মুদ্রণঃ জুলাই ১৯৯৬), পৃঃ ২৭৮।
৪৩. তদেব, পৃঃ ২৭৯।

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

চিকিৎসা জগৎ

ডেঙ্গুজ্বরঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও প্রতিকার

*ডাঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ভূঁইয়া**

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিধানে ডেঙ্গুজ্বরের প্রতিষেধক ও সুন্দর চিকিৎসার বিধান রয়েছে। হ্যানিম্যানের সময় থেকে আজ পর্যন্ত হোমিওপ্যাথির যে জনপ্রিয়তা তার অন্যতম প্রধান কারণ কলেরা, স্কার্লেট ফিভার, বসন্ত, হাম প্রভৃতি সংক্রামক ও মহামারী রোগের সার্থক ও সফল প্রতিষেধক ও চিকিৎসা। তবে অন্যান্য পদ্ধতিতে যেমন আগে থেকেই একটি প্রতিষেধক ঔষধ বা টিকা একটি রোগের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে তা সব ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না। কারণ হোমিওপ্যাথি শুধু কোন একটি রোগের চিকিৎসা করে না, চিকিৎসা করে সমগ্র রোগীটির।

রোগ নিবারক চিকিৎসার ক্ষেত্রেও কোন একটি মহামারী রোগ আজ যে লক্ষণসমষ্টি নিয়ে দেখা দিল, দু'এক বছর পরে সে রোগেরই মহামারী ভিন্নতর লক্ষণসমগ্র নিয়ে ও অন্য ঔষধের চিত্র নিয়ে উপস্থিত হ'তে পারে। তাই আজকের 'কলেরা' মহামারীতে প্রতিষেধক ঔষধ 'ভিরেট্রাম' হ'লে পরের বছর 'কুপ্রাম' বা 'ক্যাম্ফার' হ'তে পারে। তবে কেবলমাত্র বসন্ত, হাম, ডেঙ্গু প্রভৃতি স্পর্শ সংক্রামক মহামারী (Epidemic resulting form contagious principle) রোগের প্রকৃতিতে সব সময় একই নিয়ম থাকে। তাই সে সব রোগের প্রতিষেধক ঔষধ আগে থেকেই নির্ধারণ করে রাখা যায়। সে জন্যই কোন মহামারী রোগের লক্ষণসমষ্টি একটিমাত্র রোগী দেখে জানা যায় না, কয়েকটি বিভিন্ন গঠনের রোগীর অবস্থা ও লক্ষণসমষ্টি দেখেই প্রতিষেধক ঔষধ নির্বাচন করতে হয়। এভাবে নির্বাচিত ঔষধই এবারের কোন মহামারীর প্রতিষেধক ঔষধ, যাকে হোমিওপ্যাথিতে "Epidemicus" বলে।

আবার সংক্রামক রোগগুলির বেলায় বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমনঃ স্থানীয় (Endemic), বিক্ষিপ্ত (Sporadic) ও মহামারী (Epidemic)। এসব রোগের জন্য হ্যানিম্যান Acute miasm, half acute miasm, fixed miasm প্রভৃতি রোগ বীজ বা জীবাণুকে দায়ী করেছেন। বিশেষ করে হোমিওপ্যাথিক সংবিধানের বা অর্গানেনের ৬ষ্ঠ সংস্করণের ৭৩, ১০০-১০৩ সূত্র এবং পাদটীকা সমূহে এসব মহামারী চিকিৎসায় হ্যানিম্যান যে নির্দেশ দিয়েছেন চিররোগ চিকিৎসা সম্বন্ধে ঠিক একই পন্থা অনুসরণ করার উপদেশ তিনি সুন্দরভাবে বর্ণনায় এনেছেন।

শুধু তাই নয়, এ বিষয়ে হ্যানিম্যানের 'লেসার রাইটিংস' বইয়েও বেশ তত্ত্ব ও তথ্য পাওয়া যায়। ডেঙ্গুজ্বরের প্রতিষেধক হিসাবে আমরা Prophylactie (protective against disease)-এর অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে এর বিধান অনুযায়ী প্রতিবিধান হিসাবে ঔষধ প্রয়োগ করতে পারি। Prophylactic or prophylaxis treatment means drug treatment used to prevent the onset of an infectious disease. The drug should be relatively nontoxic since they may have to be given for prolonged periods. An example is antimalarials used to prevent infection after the bite of an infected mosquito. তবে এ ক্ষেত্রে Epidemicus বলে একটি Term হোমিওপ্যাথিতে রয়েছে। ডেঙ্গুজ্বরের যে common symptoms তার সাথে একমাত্র Eupatorium perfoleatum এর লক্ষণের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে এবং বিশ্বের খ্যাতনামা ও সর্বজনগ্রাহ্য গবেষকগণের গবেষণামূলক বইগুলি নিয়ে আলোচনা করলেই খুঁজে পাওয়া যায় ডেঙ্গুজ্বরের প্রধান ও নির্দিষ্ট (Specific) ঔষধ এটি। শুধু তাই নয়, রোগতত্ত্ব (pathogenesis)-এর সাথে যে ঔষধের রোগতত্ত্ব (pathogenesis)-এর বেশি সাদৃশ্য হবে সে ঔষধটিই হবে রোগ প্রতিষেধক (preventive) এবং সে ঔষধটিই হবে প্রতিষেধকমূলক চিকিৎসা। (prophylactic/prophylaxis) এমতাবস্থায় **Eupatorium Perfoliatum Preventive** ঔষধ হিসাবে গ্রহণযোগ্য। এই ঔষধটি দু'জন হোমিও চিকিৎসক সুস্থ মানব দেহে Proving করেছেন।

Any substance in crud form having the power of producing the disease as well as curing the disease in potentised form is called medicine in Homoepathy. অর্থাৎ, হোমিওপ্যাথি ঔষধ হ'ল এমন একটি বস্তু, যা স্থূল মাত্রায় প্রয়োগ করলে রোগ উৎপন্ন হয় আবার সুক্ষ মাত্রায় প্রয়োগ করলে আরোগ্য হয়। কোন ব্যক্তিকে সুস্থ অবস্থায় যদি **Eupatorium Perfoliatum** ঔষধটি নির্দিষ্ট সময় ও মাত্রায় সেবন করানো হয়, তাহ'লে ঐ ব্যক্তির শরীরে ঔষধের ক্রিয়াজনিত কৃত্রিম ডেঙ্গুর প্রভাব সৃষ্টি হবে এবং প্রাকৃতিক ডেঙ্গুজ্বর এই কৃত্রিম ডেঙ্গুজ্বরেব প্রভাবে বিকর্ষিত হবে। তখন ঐ ব্যক্তি কোনভাবেই ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হবে না।

প্রতিষেধক হিসাবে Eupatorium Perfoliatum এর প্রয়োগের পদ্ধতিঃ

কোন একটি লোককে হোমিওপ্যাথিক মতে প্রতিষেধক প্রয়োগ করতে হ'লে ঐ রোগের মহামারীর অবস্থান, স্থিতিকাল এবং ঔষধের কার্যকারিতার সময়কাল সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। চিকিৎসা গবেষকদের মতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে ডেঙ্গুজ্বরের মহামারীর প্রভাব দুই থেকে সাত মাস পর্যন্ত চলমান থাকে। হোমিওপ্যাথিক মতে **Eupatorium Perfoliatum** ঔষধটির কার্যকাল বা স্থিতিকাল ১ থেকে ৭দিন। ডেঙ্গুজ্বরের প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা নিতে হ'লে Eupatorium Perfoliatum ঔষধটি ৭ দিন অন্তর অন্তর প্রয়োগ করতে হবে মহামারীর সময়কাল পর্যন্ত। কেউ যদি মনে করেন যে সুনির্দিষ্ট ঔষধটি একমাত্রা বা দুই মাত্রা সেবন করলেই ডেঙ্গুজ্বরের প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা হয়ে গেল তাহ'লে তিনি ভুল করবেন এবং ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হ'তে পারেন।

Eupatorium Perfoliatum ঔষধটি ২০০ শক্তিই ডেঙ্গুজ্বরের একমাত্র প্রতিষেধক। অভিজাত চিকিৎসক বা গবেষকরা ২০০ শক্তিকেই প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা হিসাবে এনেছেন। আমার মতেও ডেঙ্গুজ্বরের প্রতিষেধক ঔষধ **Eupatorium Perfoliatum** ২০০ শক্তি নিম্নোক্তভাবে সেবন ব্যবস্থাই উত্তম বলে মনে করি।

(ক) শিশুদের.(১-১২ বছর) বেলায় যদি বড়িতে দেওয়ার ব্যবস্থা

* ডি আই হোম, এম ডি (লন্ডন), ফ্যাকালটি মেম্বার, অক্সফোর্ড, লণ্ডন। ৪০৫/১/এ খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯। ফোনঃ ০১৮২১৯৬৯০, ৭২১৫৩৫৫।

করা হয়, তাহ'লে ৬টি করে বড়ি দিনে ৩ বার অথবা পানিতে একমাত্রা করে দিনে ৩ বার সেব্য।

(খ) বয়স্কদের (১৩-তদুর্ধ্বে) বেলায় ৮টি করে বড়ি দিনে ৩ বার অথবা পানিতে একমাত্রা করে দিনে ৩ বার সেব্য। এভাবে ৭দিন পর পর ১দিন করে মহামারীর স্থিতিকাল বা সময়কাল পর্যন্ত সেবন প্রয়োজন।

হোমিওপ্যাথিক মতে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা ও তার প্রতিকারঃ

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হ'ল লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি। সেহেতু রোগীর লক্ষণের ভিত্তিতে ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ রোগীটির ব্যক্তি স্বাতন্ত্র অনুসারে একই রোগে বিভিন্ন রোগীর জন্য বিভিন্ন ঔষধের প্রয়োজন হয়ে থাকে। একটি এলাকায় কোন একটি রোগ Epidemic আকারে দেখা দিলে ঐ এলাকার বেশির ভাগ রোগীর লক্ষণের সাথে যে ঔষধের লক্ষণ সাদৃশ্য বেশি সে ঔষধকেই Common ঔষধ হিসাবে ব্যবস্থা করার বিধান রয়েছে।

এ বিধান বা নিয়মনীতি যদি ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয় তবে আমাদের প্রশ্ন আসে, তখন কোন্ ঔষধটির প্রয়োজন হবে? ডেঙ্গুজ্বরের যে Common symptoms রয়েছে, তার সাথে একমাত্র **Eupatorium Perfoliatum** এর লক্ষণের সাদৃশ্য রয়েছে। শুধু তাই নয়, বর্তমান সময়ে হোমিওপ্যাথিতে যে ৩৫০০ টি ঔষধ মেটেরিয়া মেডিকাতে রয়েছে এই ৩৫০০ টি ঔষধের লক্ষণের সাথে ডেঙ্গুজ্বরের লক্ষণের Common symptoms আর কোন ঔষধের লক্ষণের সাথে এত মিল বা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। **Eupatorium Perfoliatum** ঔষধটি ডেঙ্গুজ্বরের প্রধান ও নির্দিষ্ট (Specific) ঔষধ। সুতরাং ডেঙ্গুর Common symptoms বা সাধারণ লক্ষণ তো বটেই, এমনকি Pathological term এর Dengue শব্দটি **ইউপেটোরিয়াম** ছাড়া অন্য কোন ঔষধের বর্ণনায় পাওয়া যায়নি বা বলা হয়নি। এই প্রেক্ষিতে **Eupatorium Perfoliatum** ডেঙ্গুজ্বরেরও প্রধান ঔষধ হিসাবে গণ্য করা যায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ডেঙ্গুজ্বরকে ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করেছে। লক্ষণ সাদৃশ্যে আরো অনেকগুলি ঔষধ রয়েছে। ঐগুলি বিভিন্ন রোগীর জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন হয়। ঐগুলি সতর্কতার সাথে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ব্যবস্থাপত্রে আনা যায়। লক্ষণসমষ্টি হোমিওপ্যাথিতে ঔষধ লক্ষণভিত্তিতে নির্বাচন করে ব্যবস্থাপনা এবং রোগের ভাবীফল বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে ক্ষুদ্রতম মাত্রা প্রয়োগ করতে পারলে ডেঙ্গুজ্বর হোমিওপ্যাথিতেই আরোগ্য করা সম্ভব ইনশাআল্লাহ। **সিনথেসিস ও রবীন মরফীর রেপার্টরী হ'তে সংগৃহীত ডেঙ্গুজ্বরের সম্ভাব্য ঔষধগুলির নামঃ** একোনাইট, আর্সেনিক, বেলেডোনা, ব্রাইয়োনিয়া, ক্রোটেলাস হর, ফেরাম ফস, জেলসিমিয়াম, হেমামেলিস, নেট্রাম মিউর, রাস টক্স, টিউবারকুলিনাম, সালফিউরিক এসিড, সিকোল কর ইত্যাদি। এ সকল ঔষধের মাঝে প্রধান হিসাবে ডেঙ্গুজ্বরের প্রতিনিধিত্বকারী হয়ে আসে **ইউপেটো রিয়াম পারফোলিয়েটাম**।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

(ক) আভিজাত্যের পরিণাম

কিছুকাল আগের কথা। এক দেশে একটি সমুদ্র বন্দর ছিল। বন্দরটি ছিল সুরক্ষিত। সমুদ্র হ'তে সংকীর্ণ পথে বন্দরে প্রবেশ করতে হ'ত। ফলে সামুদ্রিক ঝড়ে বন্দরটির ক্ষতি হ'ত না। এই বন্দরের কল্যাণে সেখানে ব্যবসায়ী মহল গড়ে উঠেছিল। অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী বিদেশের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতেন। তাদের মধ্যে একজন মহিলা সেরা ছিলেন। তাঁর ১০টি বাণিজ্য জাহাজ ছিল।

একবার ব্যবসায়ীগণের মধ্যে চরম প্রতিযোগিতা শুরু হ'ল। সকলেই চমকপ্রদ ও মূল্যবান পণ্য আমদানী করে অন্যদের তাক লাগিয়ে দিতে চাইলেন। মহিলা ব্যবসায়ী তার জাহাজের কাপ্তানকে নির্দেশ দিলেন, 'সবচেয়ে চমকপ্রদ এবং মূল্যবান পণ্য দিয়ে জাহাজগুলি বোঝাই করে ফিরে আসতে হবে। যাতে আমার মান অক্ষুণ্ণ থাকে'। নির্দেশ পেয়ে মহিলা ব্যবসায়ীর ১০টি জাহাজের লোকজন পণ্য সংগ্রহের জন্য বন্দর ছেড়ে চলে গেল। তারা বিভিন্ন দেশের বন্দরে বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়ে নির্দেশিত পণ্যের সন্ধান করতে লাগল। কোন পণ্যই তাদের কাছে চমকপ্রদ ও মূল্যবান বলে মনে হ'ল না। অবশেষে এক বন্দরে বড় দানার সোনালী গমের দেখা পেয়ে কাপ্তানগণ ঐ গমকে চমকপ্রদ ও মূল্যবান পণ্য বলে সাব্যস্ত করল। তাদের বিবেচনায় গমই চমকপ্রদ ও মূল্যবান পণ্য হিসাবে স্থান পাওয়ার কারণ হ'ল, গম না খেয়ে কেউ বাঁচে না। সাধারণ মানুষ ছাড়া রাজা-বাদশাগণও এই গমই জীবিকার উপকরণ হিসাবে বিবেচনা করে থাকেন।

কাপ্তানদের বিবেচনায় ভুল হয়নি। তাই তারা সানন্দে ঐ গম দ্বারা জাহাজগুলি বোঝাই করে দেশের উদ্দেশ্যে ফিরে চলল।

এদিকে মহিলাটি তাঁর জাহাজগুলি ফিরে আসার প্রতীক্ষায় দিন গুণতে লাগলেন। তিনি মনে মনে স্থির করে রেখেছেন, জাহাজগুলি অবশ্যই মূল্যবান পণ্য দিয়ে বোঝাই করা হবে। জাহাজগুলি ফিরে আসার সম্ভাবনার দিন থেকে তিনি প্রতিদিনই বন্দরে যাতায়াত করতে লাগলেন। অবশেষে প্রতীক্ষিত দিন এল। জাহাজগুলি বন্দরে এসে ভালভাবে ভিড়তেই পারেনি। মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি মাল দিয়ে জাহাজগুলি বোঝাই করা হয়েছে'? কাপ্তানগণ মৃদু হেসে বললেন, 'এবার আমরা অতি উন্নতমানের গম দ্বারা জাহাজগুলি ভর্তি করে এনেছি। আমাদের বিবেচনায় এই গমই চমকপ্রদ ও মূল্যবান পণ্য হিসাবে স্থান পেয়েছে'। গমের কথা শোনামাত্রই মহিলাটি রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। রাগে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। আদেশ দিলেন, 'এই মুহূর্তেই গমগুলি পানিতে ঢেলে দিয়ে

জাহাজগুলি খালি কর'।

আদেশ শুনে কাপ্তানগণ ও জাহাজের লোকজন হতভম্ব হয়ে গেল। তারা কি করবে? আদেশ পালন না করে তো উপায় নেই। অগত্যা তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও গমগুলি পানিতে ফেলে দিয়ে জাহাজগুলি খালি করল।

অদৃশ্যলোক হ'তে এ কাজের বিরূপ ফলাফল হ'তে শুরু হয়ে গেল। গমগুলি পানিতে ভিজে ফুলে উঠল। সাগর হ'তে বালিবাহিত স্রোত এসে গমের উপর পড়তে পড়তে এক সময় বন্দরের অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে গেল। আর সেই সাথে ব্যবসায়ীদের ব্যবসারও অবসান হ'ল।

(খ) পান্থশালা

আল্লাহ পাক সময় সময় দুনিয়ার ধন-সম্পদে বিভোর মানুষকে ধন-সম্পদের মোহ হ'তে ফিরানোর জন্য কিছু অসীলা করে থাকেন। বলখী বাদশাহ ইবরাহীম বিন আদম প্রথম জীবনে আল্লাহওয়ালাই ছিলেন। কিন্তু পরে ধন-সম্পদের মোহে তিনি সে পথ হ'তে কিছুটা সরে যান। একদিন তাঁর রাজদরবারে এক অপরিচিত ব্যক্তির আগমন ঘটে। লোকটি রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি এই পান্থশালায় রাত্রি বাস করতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কথার প্রতিবাদ এল 'আপনি সম্ভবতঃ ভুল করেছেন, এটা রাজ দরবার, পান্থশালা নয়'। আগন্তুক ব্যক্তি বললেন, 'অবশ্যই এটা পান্থশালা'। এমন সময় বাদশাহ দরবারে এসে ঐ বিতর্ক শুনলেন। তিনি একটু ধমকের সুরে আগন্তুককে বললেন, 'এটা রাজদরবার, কশ্মিন কালেও পান্থশালা কর'।

আগন্তুক বললেন, 'আপনার আগে এখানে কে বাস করতেন'? উত্তর এল 'আমার আব্বা'। আপনার পরে কে বাস করবে'? উত্তর এল 'আমার ছেলে'?

এবার আগন্তুক ব্যক্তি বললেন, 'তাহ'লে এখানে কেউই স্থায়ী হয়ে বাস করতে পারছেন না। আপনার আগে আপনার পিতা বাস করেছেন, এখন আপনি বাস করছেন, পরে আপনার ছেলে বাস করবে। অতএব এটা অবশ্যই পান্থশালা'। এবার বাদশাহর চৈতন্য হ'ল। তিনি বুঝলেন, সকলেই পান্থশালার বাসিন্দা। এরপর তিনি এক রাতে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে অজানার পথে পা বাড়ালেন।

❐ *মুহাম্মাদ আতউর রহমান*
সাং- সন্যাস বাড়ী, পোঃ বান্দাইখাড়া
যেলা- নওগাঁ।

কবিতা

নিয়মের খেলা

-মুহাম্মাদ আবদুস সাত্তার
দি শেফা হোমিও হল, জোনা বাজার
পাংশা, রাজবাড়ী।

দুরন্ত সাগর তীরে পড়ন্ত বেলায়
গণিয়া চলেছি ঢেউ বসি নিরালায়।
কত শত ঢেউ গেল তুলি হাহাকার
যে ঢেউ চলিয়া যায় ফেরেনা তো আর!
ছুটিয়া আসিছে ঢেউ আরো শত শত
ওরাও চলিয়া যায় কেহ থামে না তো!
ছুটে আসা, চলে যাওয়া নিয়মের খেলা
এ খেলায় সাধ্য কার করে অবহেলা?
জীবন নির্দিষ্ট পথে চলে অনিবার
এ পথ চলার পথ নহে থামিবার।
পথহারা হয় যদি কেহ কোন কালে
অবশ্য জীবন তার ঘিরিবে জঞ্জালে।

কাণ্ডারী

- মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন
খয়েরসূতি, পাবনা।

'অহি' ছেড়ে ধোঁকায় পড়ে চললে মানুষ কাদের তরে
শান্তি পথের নকীব ভেবে কাণ্ডারী আজ করলে কারে?
আকাশের বিজলী যেমন চমকে ওঠে ধমক পেড়ে,
চোখে দেয় তাক লাগিয়ে পিছল পথে চলার তরে।
নেতারা মঞ্চে আজি গর্জে ওঠে অমনি করে
পুঁজিবাদ হাকায় গাড়ি গরীবের পিঠের পরে।
ধনীরা ওশর, যাকাত তুলে নিল যমীন হ'তে,
দুঃখী মায়ের যুবক ছেলে দস্যু হ'ল রাতে রাতে।
খুন-খারাবি, চাঁদাবাজি হয় ডাকাতি দিন দুপুরে,
জেল-যুলুমের ভয়ে ডাকাত নেতার পায়ে সিজদা করে।
জনতার ধর পাকড়ে যদি ডাকাত যায়রে জেলে,
টেলিফোন আসে নেতার, ছাড় এসব আমার ছেলে।
পুলিশের নাই অধিকার যিম্মী ওরা ভণ্ড নেতার,
তাই পকেটে ঘুষ তুলে নেয়, টাকা ছাড়া কে আছে কার?
বিমানে যায় করতে নেতা ঈদের বাজার সিংগাপুরে
তার জনতা ভুখা-নাঙ্গা ভাত জোটে না উপোষ পাড়ে।
পচা আর ছিন্ন কাপড় দিয়ে কি যায় পর্দা ঢাকা?
অথচ ওদের দিয়েই পুঁজিবাদের অট্টালিকা।
উৎসবে ঐ নেতার বাড়ির গাঁয়ে জ্বলে রঙ্গীন বাতি,
ড্রেনের খাদ্য কুড়ায় পশুর সাথে আদম জাতি।
সুদ আর ঘুষের জালায়
বেচলো ভিটা গরীবেরা,
শোষণের ফাঁদ পেতেছে আজকে দেশের শাসকেরা।
ডাস্টবিনেরি পচা-গাদায় পশুর খাদ্য মানুষে খায়,
ওদের হকের অর্থে নেতায়, থাকে এসি রুমের অট্টালিকায়।

আহলেহাদীছ যুবসংঘ

-মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ
সহ-সুপার, চাঁদপুর দাখিল মাদরাসা
রূপসা, খুলনা।

আমরা তোমার দ্বীনের সৈনিক আল্লাহ-রহমান,
হইয়াছি মোরা তাগূত হটাতে ময়দানে আগুয়ান।
লেখনি মোদের খুরধার আর শাণিত যুক্তিভরা,
হাদীছের রাজ ক্বায়েম করিয়া মুক্ত করবো ধরা।
দীর্ঘ মরু সামনে মোদের তবু নই দিশাহারা,
হুহীহ দ্বীন মেনে জান্নাত পাব, তাইতো পাগলপারা।
যুগে যুগে ধরায় আহলেহাদীছ করেছে আন্দোলন,
বলিয়ান মোরা ব্যাঘ্র সৈনিক নহি আজও হীনমন।
সংঘবদ্ধ হইয়াছি মোরা টুটিতে জাহেলী রাজ,
ঘন তাক্বলীদী প্রাচীর ভেদিয়া জাগিবে এ সমাজ।

আমি সাইফুল্লাহ

- মুহাম্মাদ সিরাজুদ্দীন
শৌলমারী, জলঢাকা।

আমি সাইফুল্লাহ, আমি বিদ্রোহী, আমি বীর
আল্লাহ ছাড়া কাউকে ডরিনা এই বিশ্ব-ধরিত্রীর।
খালেদ-তারেকের বংশধর, আমি তাদেরই ভাই
চলেছি তাই দুর্দম-দূর্বার, নাই ভয় কিছু নাই।
আমি মুসলিম, আমি মুজাহিদ, যুগে-যুগে করেছি সৃষ্টি বিপ্লবের ইতিহাস,
পৃথিবীর যত অন্যায়-অসত্য করে নির্মূল-নাশ।
খালেদ-তারেকের বংশধর হয়ে, নিয়ে তাঁদের জিহাদী প্রেরণা
চলেছি আমি তাদেরই পথে, না-না এ পথ থেকে একটুও টলবনা।
যতই আসুক ঝড়-ঝঞ্ঝা, বাধার পাহাড় ভয়াল
সব আমি পায়ে দলে-দলে করে যাব পয়মাল।
রাখব না আর বাতিলের অহমিকা, বাতিলের যত আওয়ায
নাশিতে এসব পরেছি আমি জিহাদের সাজ।
সামনে আমার জিহাদের ময়দান, হস্তে তলোয়ার
ছুটব এখুণি টুটবে বাতিল আল্লাহু আকবার।
জিহাদের ময়দানেই বাতিলের হবে শেষ পরিচয়
মুসলমান চির নির্ভীক জাতি, ভীরু কাপুরুষ নয়।
বক্ষে যাদের 'অহির-বিধান' হৃদয়ে তেজ ঈমানের
তাদের কি আর শঙ্কা থাকে ঝড়-তুফানের?
না-না কখনোই তা নয়,
হে বাংলার মুজাহিদ! ছুটে এসো এই জিহাদী দুর্জয় কাফেলায়।
আমি মুসলিম তোমাদেরই ভাই দিচ্ছি ডাক জিহাদের
তোমরা অলস হয়ে থেক না আর, হাতে লও শমসের।
দাও ডাকে সাড়া, জিহাদ পাগলরা, সব মুসলিম মুজাহিদ ভাই,
শুধু আমি নই, বিদ্রোহী সাইফুল্লাহ তোমরা যে সবাই।
জিহাদের মাঠে মুসলিম মুজাহিদের দাও পূর্ণ পরিচয়,
ক্বিয়ামত তক 'অহি-র বিধান' আল্লাহ্র যমীনে যেন সগর্বে টিকে রয়॥

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যা মেধা পরীক্ষা (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১. বাংলাদেশ।
২. বুড়িগঙ্গা, জাহাঙ্গীর নগর।
৩. চট্টগ্রাম বন্দর কর্ণফুলী নদীর তীরে এবং মংলা বন্দর পশুর নদীর তীরে অবস্থিত।
৪. নারায়ণগঞ্জ যেলার শীতলক্ষা নদীর তীরে।
৫. পদ্মা নদীর তীরে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ)

১. ইউরোপ মহাদেশের সর্ববৃহৎ নদীর নাম কি?
২. কোন্ নদীর তলদেশ দিয়ে রেলপথ নির্মিত হয়েছে?
৩. 'লন্ডন নগরী' কোন্ নদীর তীরে অবস্থিত?
৪. ইউরোপ মহাদেশের দীর্ঘতম নদীর নাম কি?
৫. কোন্ নদীর তীরে ইউরোপের ৪টি দেশের রাজধানী অবস্থিত?

সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী
বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (কুরআন)

১. সবচেয়ে বড় পাপ কোন্‌টি? এই পাপ করলে কি জান্নাতে যাওয়া যাবে?
২. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন পীর বা ওয়ালীর নিকট প্রার্থনার বিধান ইসলামে আছে কি?
৩. মৃত ব্যক্তি কি কোন কথা শুনতে পায়? অথবা কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে?
৪. জাদু শিক্ষা বা চর্চা করা সম্পর্কে মহান আল্লাহ কি বলেছেন?
৫. কোন পীর, ওয়ালী অথবা অন্য কারও মাযারে বা কবরে মানত করা যায় কি?

সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, 'সোনামণি'।

জাদু নয় বিজ্ঞান

ক্যালেন্ডার না দেখে ৩৬৫ দিনের বার বের করার অভিনব কৌশল (২০০২ সালের জন্য)ঃ

১. প্রথমে ইংরেজী ১২ মাসের নিম্নে প্রদত্ত মান মুখস্থ করতে হবেঃ
(ক) সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর (সেডি)-এর প্রত্যেকের মান=১
(খ) এপ্রিল ও জুলাই (এজুল)-এর প্রত্যেকের মান =২
(গ) জানুয়ারী ও অক্টোবর (জাঅ)-এর প্রত্যেকের মান =৩
(ঘ) ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও নভেম্বর (ফেমান)-এর প্রত্যেকের মান = ৬
(ঙ) মে, আগষ্ট ও জুন (মেআজু)-এর প্রত্যেকের মান যথাক্রমে = ৪, ৫ ও ৭।

২. বার বের করার সূত্রঃ (মান+তারিখ)−৭

৩. ভাগশেষ ০ হ'লে শুক্রবার, ১ হ'লে শনিবার, ২ হ'লে রবিবার, ৩ হ'লে সোমবার, ৪ হ'লে মঙ্গলবার, ৫ হ'লে বুধবার এবং ৬ হ'লে বৃহস্পতিবার হবে। ভাগফলের প্রয়োজন নেই।

৪. মাস ও তারিখের যোগফল ৭-এর কম হ'লে উল্লেখিত নিয়মে এমনিতেই বার বলে দেওয়া সম্ভব। ভাগ করার কোন প্রয়োজন নেই।

৫. সাধারণতঃ কোন বছরের ১ জানুয়ারী যে বার হবে, ৩১ ডিসেম্বরও সেই বার হবে। তবে অধিবর্ষ (লীপইয়ার) হ'লে ১ জানুয়ারী যে বার হবে, ৩১ ডিসেম্বর তার পরের বার হবে।

সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, 'সোনামণি'।

সোনামণি সংবাদ

২০০১-২০০৩ সেশনের 'সোনামণি' যেলা/উপযেলা পরিচালনা পরিষদ-এর তালিকাঃ

যেলা পরিষদঃ

৪. মেহেরপুরঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা নূরুল ইসলাম
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ তারীকুযযামান
পরিচালক ঃ রফীযুদ্দীন
সহ-পরিচালক ঃ মুনীরুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ নূঈদ নাকীর
সহ-পরিচালক ঃ ফাকীরুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ সাঈদুর রহমান।

উপযেলা পরিচালনা পরিষদঃ

৩. মেহেরপুর সদর, মেহেরপুরঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ একরামুল হক
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ রেফাউল হক
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ যিয়াউল হক
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ ছাদীকুল ইসলাম।

গ. গাংনী, মেহেরপুরঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আক্কাস আলী
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ তুকাদ্দেস আলী
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ শফীকুযযামান
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান।

মেহেরপুর যেলা সোনামণি সম্মেলন ২০০১

গত ২৯ ও ৩০ নভেম্বর ২০০১ মেহেরপুর যেলার বাঁশবাড়িয়া কলোনী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী দাখিল মাদরাসা প্রাঙ্গণে ২১৫ জন সোনামণি বালক, ৪৫ জন বালিকা এবং আন্দোলন, যুবসংঘ ও সোনামণি যেলা পর্যায়ের প্রায় ২০ জন দায়িত্বশীলের উপস্থিতিতে দু'দিন ব্যাপী সোনামণি যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী ডিগ্রী কলেজ, মেহেরপুরের প্রভাষক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম 'সোনামণি' সংগঠনকে 'যুবসংঘ' ও 'আন্দোলন'-এর ভবিষ্যৎ কর্ণধার বলে উল্লেখ করে বলেন, সোনামণিদের মধ্যে লুকিয়ে আছে আমাদের তথা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব। তাদেরকে চরিত্রবান ও সুন্দর করে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের। এ ধরনের সম্মেলনের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি 'সোনামণি' সংগঠনের দায়িত্বশীলদের অভিনন্দন জানান এবং মাঝে মাঝে এ ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্টদের উৎসাহিত করেন।

সম্মেলনে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও মর্যাদা, অন্যান্য সংগঠনের সাথে সোনামণি সংগঠনের পার্থক্য, প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, চরিত্র গঠনের উপায়, সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তিনি যেলাভিত্তিক এই প্রথম সম্মেলনের আয়োজন করার জন্য আয়োজকদের এবং 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উপস্থিত সকলকে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সাথে সাথে সকল যেলায় এ ধরনের সম্মেলন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি সাহারবাটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। সম্মেলনে আরো প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক আব্দুল মুকীত।

সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন 'সোনামণি' অত্র যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ রফীযুদ্দীন (অবঃ আর্মি, ইঞ্জিনিয়ার শাখা), সভাপতিত্ব করেন সাহারবাটী আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম ও ধর্মদহ মাদরাসার সুপার মাওলানা মুহাম্মাদ যহীরুদ্দীন, অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র যেলার সোনামণি সহ-পরিচালক মুনীরুযযামান, পুরস্কার বিতরণ করেন গাংনী থানার সোনামণি প্রধান উপদেষ্টা জনাব আক্কাস আলী। সম্মেলনে সার্বিক সহযোগিতা করেন সাঈদুর রহমান, আব্দুল হান্নান ও নুঈদ নাকীর।

পরিশেষে সোনামণি যেলা পরিচালক উপস্থিত সকল সোনামণি ও দায়িত্বশীলদের অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে দো'আ পাঠের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সম্মেলন শেষে সোনামণিদের এক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ী নিম্নোক্ত সোনামণিদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হয়ঃ

১. মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন (চাঁদপুর শাখা), তেলাওয়াত, ব্রঞ্চপদক।

২. মুহাম্মাদ হাসীবুল ইসলাম (সাহারবাটী), আযান, ব্রঞ্চপদক।

৩. মুহাম্মাদ যামানুর রশীদ (বাঁশবাড়িয়া কলোনী), জাগরণী, ব্রঞ্চপদক।

৪. আব্দুল মুমিন (ঐ), বক্তৃতা, ব্রঞ্চপদক।

৫. নুঈদ নাকীর (সাহারবাটী), শ্রেষ্ঠ পরিচালকের দায়িত্ব পালন।

সোনামণি প্রশিক্ষণ

কুষ্টিয়া পশ্চিমঃ

(১) গত ৩০ নভেম্বর শুক্রবার বাদ মাগরিব যেলার ধর্মদহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র এবং পবিত্র

রামাযানের গুরুত্ব ও মর্যাদার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন। প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন অত্র যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও যেলা 'সোনামণি'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়া। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যেলার 'সোনামণি' সহ-পরিচালক আব্দুল মুক্বীত।

(২) গত ১লা ডিসেম্বর শনিবার সকাল ১০-টা হ'তে দুপুর ২-টা পর্যন্ত যেলার কিশোরীনগর উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ৭ জন সোনামণি পরিচালক, সহ-পরিচালক ও উপদেষ্টা এবং ৬৪ জন সোনামণির উপস্থিতিতে সোনামণি আব্দুল জাব্বার ও মাহফূযুর রহমানের কুরআন তেলাওয়াত ও জাগরণী পাঠের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উদ্বোধনী ভাষণ দেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও যেলা 'সোনামণি'র উপদেষ্টা মাওলানা মাজীদুল ইসলাম। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে সোনামণিদের চরিত্র গঠন, সালাম প্রদানের পদ্ধতি ও গুরুত্ব, কথা বলা ও আচরণ, জুতা-স্যাণ্ডেল, জামা-কাপড় পরা ও চুল আঁচড়ানোর ইসলামী বিধান, সাধারণ জ্ঞান, মেধা পরীক্ষা ইত্যাদির উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা রাখেন 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক আব্দুল মুক্বীত, যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব আব্দুর রাযযাক। তিনি সোনামণিদের প্রশিক্ষণের পদ্ধতি ও নীতিমালা সরাসরি পর্যবেক্ষণ করে আবেগময় বক্তব্য রাখেন এবং এ সংগঠনের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি কামনা করে আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন যেলার 'সোনামণি' পরিচালক ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহসিন আলী।

চাঁপাই নবাবগঞ্জঃ

(১) গত ৩০ নভেম্বর শুক্রবার যেলার বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আবু তাহের। তিনি সোনামণি সংগঠনের গুরুত্বের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা রাখেন। প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক্ব। তিনি সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র ও আচরণের উপর প্রশিক্ষণ দেন। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ যিয়াউল ইসলাম।

(২) গত ৩০ নভেম্বর শুক্রবার সকাল ৮-টা ৩০ মিনিট থেকে ১১-টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত নবাবগঞ্জ সদর পিটিআই (মাষ্টারপাড়া) যেলা কার্যালয়ে আব্দুস সাত্তারের কুরআন তেলাওয়াত এবং ফয়যুয যুহার জাগরণী পাঠের মাধ্যমে প্রায় ১০০ জন সোনামণির উপস্থিতিতে সোনামণি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন যেলার 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং মূলমন্ত্রের উপর পিটিআই (মাষ্টার পাড়া) জামে মসজিদের খতীব মাওলানা নযরুল ইসলাম, নীতিবাক্য ও গুণাবলীর উপর যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা নযরুল ইসলাম, সাধারণ জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের প্রশ্নোত্তরের উপর মশীউযযামান (শাহীন) হাতে কলমে সোনামণিদের প্রশিক্ষণ দেন। বৈঠক শেষের দো'আ পাঠের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

পাবনাঃ

গত ৬ ডিসেম্বর ২০০১ বৃহস্পতিবার সকাল ৮-টা ৩০ মিনিট হ'তে দুপুর ১২-টা পর্যন্ত ৫০ জন সোনামণি এবং 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর ১০ জন দায়িত্বশীলের উপস্থিতিতে খয়েরসূতী মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন। প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ যিয়াউল ইসলাম। তিনি সোনামণি সংগঠন, সাধারণ জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় দো'আ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম।

রাজশাহীঃ

গত ১৮ নভেম্বর ২০০১ রাজশাহী মহানগরীর হাতেম খাঁ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২২ নভেম্বর সপুরা মিয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২৩ নভেম্বর গোদাগাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২৪ নভেম্বর উছড়াকান্দর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২৫ নভেম্বর বানেশ্বর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২৬ নভেম্বর মৌগাছি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২৮ নভেম্বর হাটগাঙ্গোপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ১ ডিসেম্বর রাজশাহী মহানগরীর শামসুন্নাহার মাদরাসায়; ৩ ডিসেম্বর বহরমপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ৪ ডিসেম্বর ঝাউবোনা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ৭ ডিসেম্বর খানপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ও বানেশ্বর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ৮ ডিসেম্বর মজপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এবং ১০ ডিসেম্বর ধুরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির, সমাবেশ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সফর সমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয়, রাজশাহী যেলা, মহানগরী ও উপযেলার দায়িত্বশীলবৃন্দ।

নওগাঁঃ

গত ৪ ডিসেম্বর ২০০১ ইং তারিখে নওগাঁ যেলার আনন্দনগর আহলে[illegible] জামে মসজিদে ৫৪ জন সোনামণির উপস্থিতিতে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল মুক্বীত। তিনি ইসলামী সাধারণ জ্ঞান, ধাঁধাঁ, আক্বীদাহ ও সোনামণি সংগঠন ও অন্যান্য শিশু-কিশোর সংগঠনের মৌলিক পার্থক্য সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ছাত্র হাফেয মুহাম্মাদ রবী'উল ইসলাম, নওগাঁ যেলা সোনামণির পরিচালক মুহাম্মাদ আউয়ুব হোসাইন ও যেলা যুবসংঘ-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবু মূসা আব্দুল্লাহ। বৈঠক শেষের দো'আ পাঠের মাধ্যমে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

ভারত থেকে অবাধে চোরাচালানে আসছে 'এইডস'সহ প্রাণঘাতী রোগবাহী রক্ত

বিস্তীর্ণ সীমান্তের উন্মুক্ত বহু পথে ভারত থেকে রক্ত চোরাচালান হচ্ছে বাংলাদেশে। অজস্র রকম ভারতীয় চোরাচালানী পণ্যের মত আসছে রক্ত। কখনো বিভিন্ন পাচারকৃত পণ্যের ভেতরে আড়ালে, কখনোবা পেশাদার রক্ত বিক্রেতারা সরাসরি এসে দেশের অভ্যন্তরে রক্ত দিয়ে যাচ্ছে। দিনের পর দিন বাড়ছে ভারতীয় রক্তের চোরাচালান। যা দিয়ে বাংলাদেশের রক্তের ঘাটতি কিছুটা পূরণ করা হচ্ছে রোগীদেহে সঞ্চালনের মাধ্যমে। কিন্তু ভারত থেকে চোরাচালানে আসা রক্ত ব্যবহারের পরিণাম সম্পর্কে কড়া সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন চিকিৎসকদের সূত্র।

সূত্র মতে, দেশে রোগীদেহে সঞ্চালন বা জীবন রক্ষার তাকীদে বছরে ২ লাখ ৬০ হাযার ব্যাগ রক্তের চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে রোগীর আপনজন ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উৎস থেকে ৭০ হাযার ব্যাগ রক্ত পাওয়া যায়। পেশাদার রক্ত বিক্রেতাদের কাছ থেকে আসে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাযার ব্যাগ রক্ত। পেশাদার রক্তদাতাদের এবং অর্ধ লাখ ব্যাগ ঘাটতির মধ্যেও একটি অংশের যোগান আসে অজ্ঞাত বা জ্ঞাতসারে ভারত থেকে চোরাচালানে আনীত রক্ত থেকে।

চিকিৎসক সূত্র মতে, দেশে পেশাদার রক্ত বিক্রেতাদের রক্ত শতকরা ৯৫ ভাগই কোন না কোনভাবে জীবাণু দূষিত। তাছাড়া রোগীদেহে প্রয়োজনীয় উপাদানের ঘাটতিও রয়েছে। সে ক্ষেত্রে ভারত থেকে চোরাচালানকৃত রক্ত আরো অনেক বেশী মাত্রায় জীবাণু সংক্রামিত। এই দূষিত রক্ত থেকে দেশে এইডস, হেপাটাইটিস বি, জন্ডিস, যৌনবাহিত রোগ (এসটিডি) সহ বিভিন্ন ধরনের ঘাতক ব্যাধির বিস্তার ঘটতে পারে। ফলে দেশে মারাত্মক জনস্বাস্থ্য সংকট সৃষ্টি হ'তে পারে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আগরতলার বেশ কিছু দারিদ্রপীড়িত এলাকা থেকে পেশাদার রক্তদাতাদের মাধ্যমে বাংলাদেশে চোরাই পথে রক্ত আসছে। ভারতের ঐসব এলাকা ইতিমধ্যে 'এইডসে'র জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত।

হাসিনা-রেহানার নিরাপত্তা আইন বাতিল

শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার বিশেষ নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত আইন 'জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা আইন' রহিত করে গত ২রা ডিসেম্বর ২০০১ জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতভাবে বিল পাস হয়েছে।

আইনমন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমাদ বিলটি সংসদে উত্থাপন করেছিলেন। বিলটি পাসের আগে দেওয়া বিবৃতিতে তিনি বলেন, সংবিধান পরিপন্থী এই আইন বাতিলের প্রতিশ্রুতি বিএনপি দিয়েছিল। আওয়ামী লীগ প্রণীত এ আইনের উদ্দেশ্য নিরাপত্তা ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক।

এ বিল পাসের সময় তাজুল ইসলামসহ জাতীয় পার্টির ৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। জাপা সংসদীয় দলের নেত্রী রওশন এরশাদ বিল পাসের পর সংসদ কক্ষে প্রবেশ করেন। তাছাড়া জাপা (মি-ম) সদস্য আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও কৃষক-শ্রমিক-জনতা লীগের কাদের ছিদ্দীকী অনুপস্থিত ছিলেন।

দরিদ্র বিচার প্রার্থীরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে

-আইনমন্ত্রী

আইনের জটিলতার কারণে প্রকৃত দরিদ্র বিচার প্রার্থীদের ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা উল্লেখ করে অর্থের অভাবে দরিদ্র ও অসহায় জনগণ মামলা চালিয়ে যাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হওয়ার প্রতি যত্নবান ও সতর্ক থাকার জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমাদ বিচারক ও আইনজীবীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। মন্ত্রী গত ৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ আইন সমিতির ১৬তম সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির ভাষণে এ আহ্বান জানান।

১৫ আগষ্ট ও ১৭ মার্চের ছুটি বাতিল

সাবেক প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুদিবস ১৫ আগষ্ট ও জন্মদিন ১৭ মার্চের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। গত ২৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার সাপ্তাহিক বৈঠকে উক্ত দু'দিনের জাতীয় ছুটি বাদ দিয়ে এবং ৭ নভেম্বরের ছুটি পুনর্বহাল করে ২০০২ সালের ছুটির তালিকা অনুমোদন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার অব্যবহিত পরে মন্ত্রিসভার এক সিদ্ধান্তে সাবেক প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুদিবস ১৫ আগষ্ট জাতীয় ছুটি ঘোষণা করে। পরে ১৯৯৭ সালের ছুটির তালিকা অনুমোদনকালে শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ১৭ মার্চকেও জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা হয়। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২০০২ সালে জাতীয় ছুটি দু'দিন কমে ১৩ দিন হয়েছে। নির্বাহী আদেশের ছুটি ৮দিন বহাল রয়েছে।

চিন্তন হোসেন যুক্তরাষ্ট্রের সেরা ৯ ছাত্রের একজন

বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত চিন্তন হোসেন (১৫) যুক্তরাষ্ট্রের সেরা ৯ জন ছাত্রের একজন হিসাবে ৫০ হাযার ডলারসহ 'ডেভিডসন ফেলো লরেট এওয়ার্ড' পেয়েছে। ডেলওয়ার স্টেটের উইলমিংটন সিরি চার্টার স্কুলের ছাত্র চিন্তন কম্পিউটার প্রযুক্তির সাহায্যে হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক এবং

অস্বাভাবিক ক্রিয়া পর্যবেক্ষণের সর্বাধুনিক একটি পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য এই এওর্য়াডটি পেয়েছে। তার উদ্ভাবিত পদ্ধতির সাহায্যে হৃদকোষ সমূহের গতিবিধিও মনিটরিং করা সম্ভব।

নাভাদাভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ডেভিডসন ইনষ্টিটিউট প্রদত্ত এই এওয়ার্ডের ৯ জনকে দু'টি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম গ্রুপে ৩ জনের প্রত্যেকে ৫০ হাযার ডলার এবং দ্বিতীয় গ্রুপের ৬ জনের প্রত্যেকে ১০ হাযার ডলার করে পেয়েছে। চিন্তন হোসেনের এই প্রকল্পটি এ বছরের জাতীয়ভিত্তিক বিজ্ঞান মেলাতেও এওয়ার্ড পেয়েছে।

চিন্তন হোসেনের পিতা ডঃ মুর্শেদ হোসেন ফিলাডেলফিয়ার টমাস জেফারশন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক এবং মা সুফিয়া খাতুন গৃহবধূ। কুমিল্লার হোমনা উপযেলার সন্তান মুর্শেদ হোসেন ১৯৭৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পিএইচডি করতে যান। তিনি ভার্জিনিয়ার কলেজ অব উইলিয়াম এণ্ড মেরী থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে ডক্টরেট করেন। এরপর নিউইয়র্কে বসবাসকালে চিন্তনের জন্ম হয়।

বাংলা একাডেমির হালচাল

শেখ মুজিবর রহমানের জীবনী প্রকল্পের নামে ১০ লাখ টাকা আত্মসাৎ

'জাতির মননের প্রতীক' বলে পরিচয়দানকারী দেশের সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র বাংলা একাডেমীতে গত পাঁচ বছরের আওয়ামী লীগ শাসনামলে চলেছে দুর্নীতি, লুটপাট, স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার ও দলীয়করণের মহোৎসব। এর মধ্যে 'শেখ মুজিবর রহমানের জীবনী প্রকল্পে'র নামে এক পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপিও জমা না দিয়ে ১০ লাখ টাকা আত্মসাতের এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অভিযোগে প্রকাশ, বাংলা একাডেমীর নাম ব্যবহার করে এই টাকা আত্মসাৎ করেছেন সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের অর্থমন্ত্রী ও অপর একজন আওয়ামী লীগ নেতার সংগঠন 'বাংলাদেশ ফাউণ্ডেশন'। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের নির্দেশে বাংলা একাডেমীর তৎকালীন মহাপরিচালক ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসাইনের তত্ত্বাবধানে শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীর নামে মোট ৩০ লাখ টাকার একটি প্রকল্প প্রণীত হয়। সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে চুক্তির শর্ত লংঘন করে এক পৃষ্ঠা পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন না করেই ইতিমধ্যে এ উপলক্ষে ১০ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

২৩ শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ধরিয়ে দিলে সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা পুরস্কার

সরকার রাজধানীর শীর্ষ সন্ত্রাসীদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০১ বুধবার ২৩ জন সন্ত্রাসীর নাম ঘোষণা করে তাদের ধরিয়ে দিতে জনগণের সহযোগিতা কামনা করা হয় এবং ২৭ ডিসেম্বর পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। ৮ জনকে ধরিয়ে দিলে প্রত্যেকের জন্য এক লাখ এবং বাকীদের প্রত্যেকের জন্য ৫০ হাযার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিকে জানা যায়, যে ২৩ জনকে ধরিয়ে দিতে পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে, তাদের মধ্যে টোকাই সাগর কিছুদিন পূর্বে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সপরিবারে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছে। সুব্রত বাইন, মোল্লা মাসুদ, জয় ও কামাল পাশা সহ ৯ জন আছে কলিকাতায়।

সন্ত্রাসীদের প্রকাশিত তালিকা নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠেছে। ২৩ জনের তালিকায় যাদের নাম আছে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একটি থেকে সর্বোচ্চ ১৯টি পর্যন্ত মামলা রয়েছে। আবার ১৭টি মামলার আসামীও তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। ঢাকার পূর্বাঞ্চলের শীর্ষ সন্ত্রাসীদের তালিকায় এক নম্বরে যার নাম রয়েছে তার বিরুদ্ধে রয়েছে শ্যামপুর, সূত্রাপুর, ডেমরা ও কেরানীগঞ্জ থানায় ১৭টি মামলা। ঐ সন্ত্রাসীর নাম তালিকায় নেই।

যাদের ধরিয়ে দিতে ১ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে তারা হচ্ছে ইবরাহীমপুর, কাফরুলের কালা জাহাঙ্গীর, দক্ষিণ পাইকপাড়া, মিরপুরের প্রকাশ কুমার বিশ্বাস, মীরবাগ, রমনার মোল্লা মাসুদ, বড় মগবাজার, রমনার ত্রিমতি সুব্রত বাইন, শ্যামপুরের মুহাম্মাদ হান্নান ওরফে পিচ্চি হান্নান, ইস্কাটনের লিয়াকত, কামরুল হাসান ওরফে হান্নান এবং গুলশানের আমীনুর রসূল সাগর ওরফে টোকাই সাগর।

যাদের ধরিয়ে দিলে ৫০ হাযার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে তারা হচ্ছে পূর্ব রায়ের বাজার, ধানমণ্ডির টিটন, মালিবাগ বাজার রোড, খিলগাঁওয়ের সোহেল ওরফে ফ্রিডম সোহেল, ইন্দিরা রোড, তেজগাঁওয়ের খন্দকার তানভীর ইসলাম ওরফে জয়, নূরজাহান রোড, মুহাম্মাদপুরের হারিস আহমেদ ওরফে হারেস, সিদ্ধেশ্বরী লেন, রমনার খোরশেদ আলম ওরফে রাসু; মহাখালী ওয়্যারলেস গেইট, গুলশানের ইমাম হোসেন; রাযিয়া সুলতানা রোড, মুহাম্মাদপুরের জব্বার মুন্সী; ইবরাহীমপুর, কাফরুলের আব্বাস ওরফে কিলার আব্বাস, মশিউর রহমান কচি; কাজী নজরুল ইসলাম রোড, মুহাম্মাদপুরের কামালপাশা ওরফে পাশা; বড় মগবাজার রমনার আরমান, পিসি কালচার হাউজিং, মুহাম্মাদপুরের ইমামুল হোসেন ওরফে হেলাল ওরফে পিচ্চি হেলাল; উত্তরবাড়ী, তেজগাঁওয়ের মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন, আব্দুল হাদী লেন, কোতোয়ালির শামীম আহমেদ ওরফে আগা শামীম; উত্তর শাহজাহানপুরের জাফর আহমেদ ওরফে মানিক।

বিদেশ

টুইন টাওয়ার ধ্বংসে যুক্তরাষ্ট্রের ১০ হাযার কোটি কোটি (১০^১৪) ডলার ক্ষতি হয়েছে

যুক্তরাষ্ট্রে গত ১১ সেপ্টেম্বরের হামলায় মার্কিন অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এক ট্রিলিয়ন ডলারের বেশী বলে উসামা বিন লাদেন বলেছেন। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের বিশ্ব অর্থনীতি সম্পর্কিত অতি সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্টে এই হামলায় মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেওয়া হয়েছে প্রায় ২৫ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার। গত ২৭ ডিসেম্বর কাতারভিত্তিক আল-জাজিরা টেলিভিশনে প্রচারিত ওসামা বিন লাদেনের দেওয়া ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণের চেয়ে আইএম এফ-এর দেওয়া হিসাব অনেক কম।

এশিয়ার লৌহমানবী গ্লোরিয়া আরোয়ো

ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট গ্লোরিয়া ম্যাকাপাগাল আরোয়োকে 'এশিয়ার লৌহমানবী' খেতাব দিয়েছে লণ্ডনের ফিন্যান্সিয়াল টাইমস পত্রিকা। বর্ষপঞ্জি রিপোর্টে তাঁকে বিশ্বের ৫ আলোচিত নেতার তালিকায় রাখা হয়েছে। যেখানে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারও রয়েছেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ফিলিপাইন চলতি বছর এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। ফলে এ বছর প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ৩ শতাংশ দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। আরো বলা হয়েছে, অরোয়ো বুঝতে পেরেছেন তাঁর কিছুটা ইমেজ সংকট রয়েছে। তিনি ধনিক শ্রেণীর প্রেসিডেন্ট হিসাবে পরিচিত। কারণ দামী পোশাকের প্রতি তাঁর যথেষ্ট মোহ রয়েছে।

সাপ খেকো চীনা জাতি

সাম্প্রতিক এক জরিপের উদ্ধৃতি দিয়ে চীনের সরকারী সংবাদপত্র গত ৬ ডিসেম্বর জানিয়েছে, ঔষধ তৈরী এবং উপাদেয় খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য নির্বিচারে সাপ ধরার ফলে চীনে সাপের বিরল প্রজাতি সমূহ ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। 'চায়না ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশনাল এসোসিয়েশন' জানিয়েছে, গোটা চীনে প্রতি বছর ১০ হাযার টনেরও বেশী সাপ খাওয়া হয়। এতে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলা হয়, ব্যাপকহারে সাপ নিধনকারী প্রদেশগুলির এই তৎপরতা বন্ধ করা না হ'লে সাপের ধ্বংস রোধ করা যাবে না। চীনের দক্ষিণাঞ্চলে সাপ খাওয়া এবং সাপের রক্ত ও পিত্তশয়ের সুরভী মিশ্রিত মদ্যপান বিশেষভাবে জনপ্রিয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে চীনে মোট ২০৯ প্রজাতির সাপ রয়েছে, যা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সাপের মোট প্রজাতির সংখ্যার শতকরা ৭ ভাগ।

'এইডস'-এ ২ কোটি ৫০ লাখ লোকের মৃত্যু, আক্রান্ত ৪ কোটি

১৯৮১ সালে পৃথিবীর উন্নয়নশীল এবং শিল্পোন্নত দেশে 'এইডস' রোগ ধরা পড়ার পর গত ২১ বছরে এই রোগে সারা বিশ্বে ২ কোটি ৫০ লাখ লোকের মৃত্যু হয়েছে। ইউএনএস/এইডস সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে আরো বলা হয়, সমগ্র বিশ্বে ৪ কোটি মানুষ বর্তমানে 'এইডস' রোগে আক্রান্ত এবং প্রতিবছর আক্রান্তের সংখ্যা আরো বাড়ছে। কেবলমাত্র ২০০১ সালে 'এইডস' আক্রান্ত হয়েছে ৫০ লাখ মানুষ। একই সময়ে মারা গেছে ৩০ লাখ।

ওপেকের তেল উৎপাদন দৈনিক ১৫ লাখ ব্যারেল হ্রাসের সিদ্ধান্ত

বিশ্ববাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে তেল উৎপাদনকারী দেশগুলির সংগঠন 'ওপেক' প্রতিদিন ১৫ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সিদ্ধান্তের ফলে 'ওপেক' সদস্য দেশগুলির মোট উৎপাদন ৬ শতাংশ কমে যাবে। 'ওপেক' আরো জানায়, আগামী ৬ মাস পর্যন্ত হ্রাসকৃত হারে সদস্য দেশগুলি তেল উৎপাদন করে যাবে।

উল্লেখ্য, 'ওপেক' সদস্য নয় এমন স্বাধীন তেল উৎপাদনকারী দেশ যেমন রাশিয়া ও নরওয়ে তেল উৎপাদন হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রেক্ষিতে 'ওপেক' এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পাকিস্তানে তথ্য পাচারের দায়ে ভারতীয় কর্মকর্তা গ্রেফতার

ভারতীয় পুলিশ জানিয়েছে, পার্লামেন্ট প্রশাসনের উর্ধ্বতন নির্বাহী সহকারী অজয় কুমারকে ভারতে প্রতিরক্ষা ও আণবিক শক্তির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও দলীল পাকিস্তান হাই কমিশনের কর্মচারী মুহাম্মাদ শরীফ খানের কাছে পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। ভারতীয় পুলিশের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে ভারতীয় কর্মকর্তা স্বীকার করেছে যে, পাকিস্তান হাইকমিশনের কর্মকর্তা বেশ কয়েকবার তার কাছে পার্লামেন্ট ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়েছে এবং পার্লামেন্টের কার্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণের জন্য একটি পাসের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়েছে। এদিকে পাকিস্তান শরীফ খানকে অপহরণ এবং নির্যাতনের জন্য ভারতকে দায়ী করেছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নয়া দিল্লীর একটি বিপণন কেন্দ্রে কেনাকাটার সময় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা তাকে অপহরণ করে এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাকে নগ্ন করে বেদম প্রহার করা হয়। মেডিকেল রিপোর্টেও বলা হয়েছে, খানকে নির্দয়ভাবে প্রহার ও নির্যাতন করা হয়েছে। পাঁচ ঘন্টা পর পাকিস্তানী দূতাবাসের এ কর্মচারীকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তার কাছ থেকে গুপ্তচরবৃত্তির সঙ্গে জড়িত থাকার স্বীকারোক্তিমূলক স্বাক্ষর জোরপূর্বক আদায় করে নেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে বিমান যাত্রীর জুতা থেকে বিস্ফোরক উদ্ধার

গত ২৩ ডিসেম্বর আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ৬৩, বোয়িং ৭৬৭ মায়ামী থেকে প্যারিস যাওয়ার পথে ১৮৫ জন যাত্রী ও ১২ জন ক্রু নিয়ে বোস্টনের লোগান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যরূরী অবতরণ করতে বাধ্য হয়। বিমানের একজন যাত্রীর জুতার ভেতর বিস্ফোরক পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ এ ব্যবস্থা নেন। এই ঘটনার পর বৃটিশ ও মার্কিন বিমান সংস্থাগুলির মধ্যে ওসামা বিন লাদেনের সংগঠন 'আল-ক্বায়েদা'র সদস্যদের অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার ব্যাপারে নতুন করে আতংক সৃষ্টি হয়েছে।

বিমান কর্তৃপক্ষের পরিচালক টম কিনটন বলেন, মধ্য আকাশে লোকটি একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালালে তার প্রতি বিমানের এক এটেনডেন্টের দৃষ্টি পড়ে। বিমানের এটেনডেন্টরা সালফারের ঘ্রাণ পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সতর্ক হয়ে যায় এবং দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এক পর্যায়ে রীতিমত ধস্তাধস্তি হয়। কিনটন বলেন, বিমানটি ধ্বংসের জন্য তার কাছে পর্যাপ্ত বিস্ফোরক ছিল। সি-টু নামের এই বিস্ফোরক পরিমাণে সামান্য হ'লেও বিমান ধ্বংস করার জন্য তা যথেষ্ট।

উদ্ধারকৃত ২৪ গ্রামের প্লাস্টিক বিস্ফোরক উড়ন্ত অবস্থায় বিমানের দেয়াল বা জানালা উড়িয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। এরপর বিমানটি নিজে নিজেই টুকরো হয়ে যেত বলে বোস্টন পুলিশের বোমা টেকনিশিয়ান ও ক্যাফে জ্যাক জানান। তিনি জানান, এই বোমাটি বিস্ফোরণ ক্যাপ ছাড়াই বিস্ফোরণ ঘটানো যায়। যাত্রীদের জন্য এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। ২০০০ সালের ৩ অক্টোবর এই বিস্ফোরণ দিয়ে ইয়েমেনে মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ কোল-এ বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ঐ ঘটনায় ১৭ জন মার্কিন নাবিক নিহত হয় এবং আহত হয় ৩৯ জন।

ভারতীয় পার্লামেন্টে হামলা

ভারতীয় পার্লামেন্টে গত ১৩ ডিসেম্বর এক ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় ১৩ জন নিহত এবং ১৭ জন আহত হয়েছে। দূরদর্শন ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় সময় ঠিক বেলা ১১-টা ৪০ মিনিটে ৫ জন সন্ত্রাসীকে বহন করে একটি কার পার্লামেন্ট ভবনের মেইন গেট দিয়ে প্রবেশ করে এবং একজন সন্ত্রাসী শরীরে বোমা বেঁধে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে ও পার্লামেন্ট ভবনে প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু বোমা বিস্ফোরণে সে নিহত হয়। অন্য সন্ত্রাসীরা পুলিশ ও নিরাপত্তা প্রহরীদের ওপর গুলী ছুঁড়তে থাকে। নয়াদিল্লীর পুলিশ প্রধান অজয় রাজ শর্মা জানান, সন্ত্রাসীদের প্রথম দফা গুলীবর্ষণেই ৬ জন পুলিশ অফিসার, একজন সেনাবাহিনী কমান্ডো ও একজন মালি নিহত হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর ত্বরিত পদক্ষেপে সন্ত্রাসীদের সবাই নিহত হয়। সন্ত্রাসী ও পুলিশ দু'পক্ষের মধ্যে অন্ততঃ ৩৫ মিনিট ধরে গোলাগুলী চলে। এ সময় তাদের মাঝে শত শত রাউণ্ড গুলী বিনিময় হয়। হামলার সময় পার্লামেন্ট মুলতবী ছিল। এ সময়ে প্রায় ২০০ এমপি পার্লামেন্টে আটকা পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানী ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কৃষ্ণকান্তও ছিলেন।

ঘটনার পর পরই এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী বলেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। তিনি বলেন, ভারতের গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ প্রতীক পার্লামেন্টে সন্ত্রাসী হামলার পর সংগ্রাম চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। জাতির প্রতি এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা আমরা করব এবং সন্ত্রাসীদের সব অসদুদ্দেশ্য আমরা নস্যাৎ করব। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, ভারতীয় পার্লামেন্টে হামলার ব্যাপারটা নিউইয়র্কের 'বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে' সন্ত্রাসী হামলা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

এদিকে ভারত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য পন্থায় তদন্ত চালানোর বা তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ ও উপস্থাপনার চেষ্টা পর্যন্ত না করে এ হামলার কারণে পাকিস্তানকে দায়ী করেছে। এর ফলে পাক-ভারত সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। উভয় দেশ সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করেছে। বিভিন্ন সীমান্তে বিচ্ছিন্ন গুলী বিনিময়েরও সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। কাশ্মীর সীমান্তে দু'দেশের সৈন্যদের মধ্যে গত ২০ ডিসেম্বর প্রচণ্ড গুলী বিনিময়ে ৮ জন সৈন্য নিহত হয়েছে।

দু'দেশের সম্পর্ক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়ায় গত ২১ ডিসেম্বর পাকিস্তান থেকে ভারত তার রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহার এবং ইসলামাবাদের সংগে রেল ও বাস চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ পাকিস্তানভিত্তিক একটি গোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈয়বার সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছেন। ভারতের পার্লামেন্ট ভবনে হামলাকারী দু'টি জঙ্গী গোষ্ঠীর মধ্যে লস্কর-ই-তৈয়বা একটি বলে ভারত অভিযোগ করেছে। পাকিস্তান ভারতের এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, ইসলামাবাদ ভিত্তিক কোন গোষ্ঠী এই হামলার জন্য যে দায়ী, ভারত আগে তার প্রমাণ দিক। এর পরই ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

নেপালে মাওবাদীদের হামলায় কোকাকোলা কারখানা ধ্বংসঃ সংঘর্ষে ৮১ জন নিহত

নেপালের মাওবাদী গেরিলারা গত ২৯শে নভেম্বর কাঠমাণ্ডুর উপকণ্ঠে বালাজুতে একটি কোকাকোলা কারখানায় বোমা হামলা চালিয়ে এটি প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে। এদিকে নেপালের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে অন্তত ৮১ জন মাওবাদী গেরিলা নিহত হয়েছে। মাওবাদী গেরিলারা কোকাকোলা কারখানার ভেতরে দু'টি বোমা হামলা চালায়। প্রথম বিস্ফোরণটি ঘটে ভোর ৫টা ১০ মিনিটে। এর কিছুক্ষণ পরে দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি ঘটে। এই হামলায় কারখানার বোতল, ওয়াশিং প্লান্টের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে দু'টি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এতে কেউ হতাহত হয়নি।

উল্লেখ, ১৯৯০ সালে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র উৎখাত হওয়ার পর নেপালে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মাওবাদী গেরিলা কমাণ্ডার প্রচান্দের নেতৃত্বে কয়েক হাযার গেরিলা দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ৬ বছর ব্যাপী এই লড়াইয়ে প্রায় ২ হাযার লোকের প্রাণহানি ঘটেছে। নেপালের সাংবিধানিক রাজতন্ত্র বিলোপের দাবীতে '৯৬ সাল থেকে মাওবাদী গেরিলারা সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

মুসলিম জাহান

মক্কা শরীফের কাছে ৫৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার ব্যয় সাপেক্ষে বিশাল প্রকল্প অনুমোদন

সঊদী আরবের বাদশাহ ফাহদ পবিত্র মক্কা মু'আযযামায় হারাম শরীফের কাছে অবস্থিত একটি পাহাড়ে ৫৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার ব্যয় সাপেক্ষে একটি নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন করেছেন। এই প্রকল্পের আওতায় ১১টি উঁচু আবাসিক টাওয়ার নির্মাণ এবং একটি টুইন টাওয়ার ও পাঁচ তারা হোটেল নির্মাণ করা হবে। আবাসিক টাওয়ারে ৯৪২টি এপার্টমেন্ট এবং হোটেলে ১২০০টি কক্ষ থাকবে। এই প্রকল্পের আওতায় ২৩০ বছরের পুরনো আয়াদ দুর্গ ভেঙ্গে ফেলা ও পুনঃনির্মাণ করা হবে। পবিত্র মক্কা নগরী এবং ইসলামের পবিত্রতম স্থান কা'বা শরীফকে হামলার হাত থেকে রক্ষার জন্য এই দুর্গকে শত শত বছর ধরে ব্যবহার করা হচ্ছিল। চার বছরের মধ্যে এই কাজ শেষ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মাইন বিছানো আফগানিস্তান যেন আরেক মৃত্যু উপত্যকা

আফগানিস্তানে পুঁতে রাখা লাখ লাখ মাইন প্রতিদিন সেখানকার মানুষের জীবন কেড়ে নিচ্ছে। সোভিয়েত প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় পুঁতা এসব মাইন গত দু'দশক ধরে দুঃস্বপ্নের মত তাড়া করে ফিরছে আফগান জাতিকে। এর সবচেয়ে বড় শিকার শিশুরা। অজান্তেই তারা পা দিচ্ছে এই মৃত্যু ফাঁদে।

বিশ্বের সবচেয়ে বেশী মাইন পুঁতা আছে আফগানিস্তানে। এর প্রকৃত সংখ্যা যেমন কারো জানা নেই, তেমনি কেউ জানে না কোথায় ওঁৎপেতে আছে এই ঘাতক। অতি সম্প্রতি একটি এন্টিট্যাংক মাইনের ওপর দিয়ে পার হওয়ার সময় ১৩ জন যাত্রীসহ একটি মিনিবাস উড়ে যায়।

জাতিসংঘ সম্প্রতি আফগানিস্তানের মাইন পরিষ্কারে উদ্যোগ নিয়েছে। প্রাথমিকভাবে মহাসড়ক ও যেসব গ্রামের অধিবাসীরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে সেসব গ্রামের মাইন অপসারণ করা হবে। কিন্তু মাইন অপসারণ খুবই ধীর প্রক্রিয়া। এক বর্গমিটার পরীক্ষা করতেই ঘন্টার পর ঘন্টা লেগে যায়। সেখানে কোটি কোটি বর্গমিটারের স্থান পরীক্ষায় কত সময় লাগবে তা সুদূর পরাহত।

ইরাকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ১০ কংগ্রেস সদস্যের আহ্বান

মার্কিন কংগ্রেসের ১০ জন প্রভাবশালী সদস্য ইরাককে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী হামলার পরবর্তী টার্গেট করার জন্য প্রেসিডেন্ট বুশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন, জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক দল চলে যাওয়ার পর থেকে ইরাক গত ৩ বছরে তার অস্ত্র কর্মসূচীকে আরো জোরদার করেছে। আফগানিস্তানে তথাকথিত সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান শেষ হয়ে যাওয়ার পর ইরাকে হামলা চালানোর জন্য একাধিক আহ্বানের মধ্যে এটি সর্বশেষ।

এ মর্মে বুশকে লেখা পত্রে স্বাক্ষরকারী কংগ্রেস সদস্যরা হচ্ছেন সিনেটের সংখ্যালঘু দলের নেতা ট্রেন্টলট, হাউসের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান হেনরি হাইড, সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান জেসি হেলমস, সাবেক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী সিনেটর জন ম্যাককেইন ও ডেমোক্র্যাট দলের সাবেক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী সিনেটর যোশেপ লিবারম্যান।

মালয়েশিয়ায় ৩৮ হাযার বিদেশী শ্রমিক চাকুরিচ্যুত

গত জানুয়ারী থেকে নভেম্বর ২০০১ পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় ৩৮ হাযার বিদেশী শ্রমিক চাকুরিচ্যুত হয়েছে। এদের বেশীর ভাগই কর্মরত ছিল ইলেকট্রনিক্স শিল্পে। গত ৪ ডিসেম্বর এক খবরে বলা হয়, বিশ্ব অর্থনীতি মন্দার কবলে পড়ায় এ শিল্পের বিপর্যয় ঘটেছে।

মানব সম্পদ মন্ত্রী ফং চ্যান অন বলেছেন, বছরের শুরু থেকে ইলেকট্রনিক্স খাতে অধিকাংশ লোক চাকুরি হারিয়েছে। এর মধ্যে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মহিলা শ্রমিকরা। এসব পণ্যের বৃহত্তম বাজার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বাজার। এ বছর বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা এবং যুক্তরাষ্ট্রে গত ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার কারণে মালয়েশীয় পণ্যের চাহিদা দারুণভাবে হ্রাস পেয়েছে। মন্ত্রী বলেন, ৩৮ হাযার লোক চাকুরি হারালেও টেক্সটাইল, প্লাষ্টিক ও খাদ্যশিল্পে ১ লাখ ৩ হাযার নতুন পদ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আরো বলেন, চাকুরিচ্যুতদের মধ্যে ৫৩ শতাংশ মহিলা। উল্লেখ্য, মালয়েশিয়ার মোট রফতানী পণ্যের অর্ধেকের বেশী ইলেকট্রনিক্স পণ্য।

সিরিয়ায় ৪৪শ' বছরের পুরনো মাটির ভবন আবিষ্কৃত

গত ১লা ডিসেম্বর সিরীয় আরব বার্তা সংস্থা জানিয়েছে, সিরীয় ও পোলিশ প্রত্নতাত্ত্বিক দল যৌথভাবে সিরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মাটির নীচে ৪ হাযার ৪শ' বছরের পুরনো মাটির তৈরি ভবন আবিষ্কার করেছে। রাজধানী দামেস্ক থেকে আবিষ্কৃত স্থান হাসাকাহর-এর দূরত্ব ৪শ' মাইল। সেখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের পরিচালক আবদুল মাসীহ বাগডো বলেন, আবিষ্কৃত ৩ কামরার দালান প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত হ'ত। এই ভবনের অভ্যন্তরে একটি মাটির চুলো সহ একটি মানুষকে সিংহের সাথে লড়াই করা অবস্থায় পাওয়া গেছে। খৃষ্টের জন্মের ১ হাযার ৪শ' বছর আগেকার একটি কবর স্থানও পাওয়া গেছে বলে বার্তা সংস্থা জানিয়েছে। পরিচালক বাগডো আরও জানিয়েছেন যে, মাটির একটি জগ এবং এক মহিলার (৪০) কঙ্কালও পাওয়া গেছে।

ইরাকে মার্কিন হামলার প্রস্তুতি

যুক্তরাষ্ট্র যেকোন মুহূর্তে ইরাকে হামলা চালাতে পারে। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে এই হামলা চালানো হবে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের খবরে এই মর্মে জোরালো আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, ইরাকে মার্কিন হামলা এখন সময়ের ব্যাপার। মধ্যপ্রাচ্যে একজন ঊর্ধ্বতন মার্কিন কূটনীতিক বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যে ইরাকে হামলা চালাবে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তবে এই হামলা কখন হবে সেটাই প্রশ্ন। যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের সংকল্পের প্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ মিত্র জর্ডান, তুরস্ক, কুয়েত ও সঊদী আরব যুক্তরাষ্ট্রকে সহযোগিতা করতে মোটামুটি প্রস্তুত বলে জানিয়েছে। কুয়েতের তথ্যমন্ত্রী আহমাদ আল-ফাহ্দ আল-সাবাহ্'র উদ্ধৃতি দিয়ে 'নিউজ উইকে'র খবরে বলা হয়, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ হয় তাহ'লে ইরাক সন্ত্রাসবাদের অংশ।

নিউজ উইকের খবরে আরো বলা হয়, প্রচণ্ড রাজনৈতিক চাপের মুখে যুক্তরাষ্ট্রের জয়েন্ট চীফস অব স্টাফ ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলীয় এবং উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্তে ৫০ হাযার করে মার্কিন সৈন্য মোতায়েনের বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। খবরে বলা হয়, এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের স্থলবাহিনীর কমাণ্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল পল মিকোলাসেক মনে করছেন, বাগদাদ দখল করে সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করতে কমপক্ষে ডেজার্ট ষ্টর্মের অভিযানের মত ১ লাখ ৬৯ হাযার মার্কিন সৈন্য মোতায়েনের প্রয়োজন হবে।

উল্লেখ্য, কুয়েতকে ইরাকের দখল থেকে মুক্ত করার লক্ষে এ অভিযান চালানো হয়।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

তিন চোখসমৃদ্ধ প্রাণী!

সকল প্রাণীরই চোখ আছে। কিন্তু কয়টি? সহজ জবাব দু'টি। তবে এমন প্রাণীও আছে যাদের চোখ তিনটি। তিন চোখসমৃদ্ধ এ প্রাণীর নাম হচ্ছে 'টুয়াটারা' (TOATARA)। এরা দেখতে আমাদের দেশের টিকটিকির মত। এদের মাথার ডানে ও বামে একটি করে চোখ বসানো আছে। আর তৃতীয় চোখটির অবস্থান হচ্ছে প্রথমোক্ত দু'টি চোখের মাঝখানে অর্থাৎ মাথার উপর। পৃথিবীর নিউজিল্যাণ্ডেই শুধুমাত্র এই 'টুয়াটারা' নামক প্রাণীটি দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া অন্য কোথাও আর এর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

রোবট পাখি!

বিজ্ঞানীরা রোবট পাখিও তৈরী করে ফেললেন। এটা পাখির মত ডাকতে পারলেও উড়তে পারে না। পাখিটির নাম 'চিরপিচি'। পাখিটির বৈশিষ্ট্য কিন্তু সাধারণ পাখির মত নয়। পাখিটি সাধারণত সকালে ডাকাডাকি করে সবার ঘুম ভাঙ্গায়। আর রাতে মধুর সুরে ডাকাডাকি করে সবার চোখে ঘুম নামায়। যখন পাখিটির সামনে 'অ্যাকশন' বলা হয়, তখন পাখিটি বিভিন্ন সুরে গান গায়। রোবট পাখিটি ৪০টি সুরে গান গাইতে পারে। এটি প্লাষ্টিকের তৈরী হ'লেও এর কানে আছে ক্ষুদ্র যন্ত্র। এই যন্ত্র দিয়ে পাখি শোনার কাজ চালায়। রোবট পাখিটি রীতিমত হেলেদুলে রাজকীয় ভঙ্গিতে চলাফেরা করে। পাখিটির দাম ২৫ ডলার।

রূপচর্চায় কম্পিউটার

কোরিয়ানরা এক ধরনের কম্পিউটারাইজড মেশিন তৈরী করেছে। নাম দিয়েছে হ্যাণ্ডি ট্রাষ্টার। এটি দিয়ে রূপচর্চা করা যাবে। এটির সাহায্যে সুন্দরীরা তাদের নাকের গড়ন এবং কণ্ঠস্বর বদলাতে পারবে। যাদের গানের গলা বেসুরো তারা এই মেশিনে ভোকাল রেকর্ডিং করে মিষ্টি সুরের গান পরিবেশন করে শ্রোতাদের মন জয় করতে পারবেন।

পলিথিন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়

রাজধানীতে প্রতিবছর প্রায় ৩৪২ কোটি পলিথিন শপিং ব্যাগ বিভিন্ন স্থানে ফেলা হয়। এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে মারাত্মক পয়ঃনিষ্কাশনসহ অন্যান্য সমস্যা, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকী স্বরূপ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘদিন পলিথিনে মোড়ানো খাদ্য গ্রহণ করলে ক্যান্সার ও চর্মরোগের মত দুরারোগ্য ব্যাধি হ'তে পারে। পলিথিন বিশেষজ্ঞ ডঃ শাহরিয়ার হোসাইন বলেন, মাছ, মাংস ও তরি-তরকারি পলিথিন ব্যাগের মধ্যে বেঁধে রাখলে এক ধরনের তাপ উৎপাদিত হয়। এই তাপমাত্রা থেকে রেডিয়েশন ছড়ায়। ফলে খাদ্যদ্রব্যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হ'তে পারে। তিনি জানান, আমাদের দেশে পলিথিনে যে রং ব্যবহার করা হয় তা খাদ্যে বিষক্রিয়া তৈরী করবে না- এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

পণ্যবাহী জাহায প্রাণঘাতী ব্যাকটেরিয়া ছড়ায়

পণ্যবাহী জাহাযগুলি তার মধ্যস্থিত ব্যালাষ্ট পানিতে করে এক দেশ হ'তে অন্য দেশে প্রাণঘাতী ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি ছড়িয়ে থাকে বলে মার্কিন বিজ্ঞানীরা এক গবেষণায় জানিয়েছেন। মেরিল্যাণ্ডের 'স্মিথসোনিয়ান এনভারনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টারের' গবেষক গ্রেগরি রুইজের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী ১৫টি জাহায পরীক্ষা করে তার প্রায় প্রতিটির ব্যালাষ্ট পানিতে কলেরার জীবানুসহ নানা প্রকার প্রাণঘাতী ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পান। প্রতি লিটার ব্যালাষ্ট পানিতে প্রায় ১শ' কোটি ব্যাকটেরিয়া এবং ৭শ' কোটি ভাইরাস সদৃশ বস্তুকণা থাকে বলে বিজ্ঞানীরা জানান।

উল্লেখ্য যে, খালি জাহায স্থিতাবস্থায় রাখার জন্য জাহাযের ভেতর যে পানি ঢোকানো হয় তা-ই ব্যালাষ্ট পানি নামে পরিচিত।

সমুদ্র দূষণের পরিণতি

পৃথিবীতে সমুদ্র দূষণ বাড়ছেই। সমুদ্রে ফেলা হচ্ছে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ। যা সমুদ্রকেই বিষময় করছে না, পৃথিবীর জীবনের সুরক্ষাকে অনিশ্চিত করে তুলছে। পরিবেশগত বিপর্যয় ডেকে আনছে। পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ পানি, এক ভাগ স্থল। ৭১ ভাগ পানিতে ডুবে আছে। জেগে আছে ২৯ ভাগ। পানিতে ডোবা অংশটায় আছে খাল, বিল, নদী-নালা, সমুদ্র। সমুদ্রের উপর মানুষ কম-বেশী নির্ভরশীল। সমুদ্রের অগণিত মাছ, যা অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বহন করে। তাও সীসা, ক্যাডমিয়াম, ডিডিটি, মিলডেন প্রভৃতি দূষণে মারা যাচ্ছে। আবার মৎস্যজাত রোগ-ব্যাধির বিস্তার ঘটাচ্ছে সমুদ্রের নীচ দিয়ে যাওয়া পাইপলাইন, যেগুলিও তেল, মবিল, আলকাতরা পানিতে ছড়াচ্ছে। প্রতিবছর কম করে হ'লেও ১৫ লাখ টন পেট্রোলিয়াম সমুদ্রে মিশে যাচ্ছে। পেট্রোলিয়ামে আছে ন্যাপথা, কেরোসিন। পেট্রোলিয়ামের স্ফুটনাঙ্ক ১৫০-২৭৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, যা রৌদ্র তাপে বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হয়। পাখি, মাছ এমনকি মানুষকে আটকে দেয়। পৃথিবীর আবহাওয়ার উপর সমুদ্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পৃথিবী উত্তপ্ত হচ্ছে মানুষের অনাচারের কারণে অনেকটাই। উত্তপ্ততা বৃদ্ধিকে বলা হয় গ্লোবাল ওয়ার্মিং। কার্বনডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা পৃথিবীর গরম হবার অন্যতম কারণ। ৫৫,৫৫০ লাখ টন জ্বালানি প্রতিবছর মানুষ ব্যবহার করছে, যা পেট্রোল ডিজেলের মাধ্যমে কার্বনডাই-অক্সাইড ছড়াচ্ছে। সাধারণভাবে সমুদ্রের আবহাওয়া ঠাণ্ডা মনে হ'তে পারে। তারপর প্রায় শতকরা ৫৩ গুণ বেশী কার্বন এতে মিশে আছে। ফলে সমুদ্র উষ্ণ হচ্ছে ক্রমশ, বাড়ছে পানির উষ্ণতা। যাতে অনেক দেশ ডুবে যাবে। এমন আশংকা বিজ্ঞানীরা ব্যক্ত করেছেন।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

দেশের পূর্বাঞ্চলে সপ্তাহব্যাপী সফরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

রাজশাহী ২২শে ডিসেম্বর শনিবারঃ অদ্য ভোর ৬-টার কোচ ধরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ঢাকার উদ্দেশ্যে রাজশাহী ত্যাগ করেন। ঢাকা পৌঁছে ২২০ বংশাল রোডে অবস্থিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলা অফিসে বাদ মাগরিব উভয় সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন এবং ২০০১-২০০৩ সেশনের ঢাকা যেলা 'আন্দোলন' কর্মপরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অতঃপর সেখান থেকে রাত ১০-৩০ মিঃ কোচ ধরে সিলেট রওয়ানা হন। ঢাকা থেকে সফরসঙ্গী হন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (কুমিল্লা)। পথিমধ্যে ঘন কুয়াশার কারণে মেঘনা ফেরী বন্ধ থাকায় ভৈরবের তীরে সাড়ে ১০ ঘন্টা গাড়ী আটকিয়ে থাকে। ফলে ভোর সাড়ে ৪ টার স্থলে পরদিন বিকাল পৌনে ৪-টায় তাঁরা সিলেট পৌঁছেন।

উল্লেখ্য যে, দৈনিক শ্যামল সিলেট ও দৈনিক জালালাবাদ সহ স্থানীয় ৬টি দৈনিক আমীরে জামা'আতের তিনদিন ব্যাপী সিলেট সফরের বিস্তারিত কর্মসূচী প্রচার করে।

সিলেট ২৩শে ডিসেম্বর রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর সিলেটে নেমেই যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আবদুছ ছবূর, তাঁর ছোট ভাই আহমাদ ছানী, সাধারণ সম্পাদক জনাব মুনীরুল ইসলাম, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক নতুন আহলেহাদীছ জনাব আবিদ আলী সহ মাইক্রো যোগে শহর থেকে উত্তর-পূর্বে ভারতের মেঘালয় সীমান্তবর্তী পাহাড়ের কোলঘেঁষা কানাইঘাট ও জৈন্তাপুর উপযেলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং বাদ মাগরিব ৬-১৫ মিঃ কানাইঘাট উপযেলার **জৈন্তিপুর** আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৌঁছেন। সিলেটে তাওহীদ ট্রাষ্ট-এর সৌজন্যে প্রথম নির্মিত ৮৭/৯৩ নং জামে মসজিদটি এখানে অবস্থিত। পীচঢালা পথের ধারে পুকুরপাড়ে ইট বাঁধানো ঘাট সহ জামে মসজিদটি প্রথমেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হানাফী-লা-মাযহাবী (আহলেহাদীছ) দ্বন্দ্বে এখানে একজন মানুষের জীবনহানি ঘটে। ফলে আহলেহাদীছদের জন্য পৃথকভাবে এই জামে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। গ্রামের প্রথম আহলেহাদীছ যমীর মোল্লার ওয়াক্ফকৃত মাটিতেই মসজিদটি স্থাপিত হয়েছে। যদিও তাঁর বংশে এখন কেউ বেঁচে নেই। মসজিদে কোন ইমাম নেই। আধা কিলোমিটার দূরে ধলপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদটি এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফীদের দখলে। আমানদারী মুনশীজীর মৃত্যুর পরে এখন সেখানে আহলেহাদীছ-এর দাওয়াত দেওয়ার কেউ নেই। উভয় গ্রামে কোন আলেম নেই।

জৈন্তিপুর জামে মসজিদে সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাদেরকে যেকোন মূল্যে স্বীয় আদর্শমূলে ঐক্যবদ্ধ থাকার এবং নিজ গ্রামের ছেলেদেরকে 'আলেম' হিসাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন উপস্থিত তরুণ ছাত্র ও যুবকদেরকে বিভিন্ন অনৈসলামী ও ইসলামের নামধারী বিদ'আতী সংগঠন সমূহ থেকে বিরত থেকে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র পতাকা তলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান।

এখানকার অনুষ্ঠান শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত জৈন্তাপুর উপযেলার **সেনগ্রামের** উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং রাত্রি সাড়ে ৮ ঘটিকায় সেখানে মাষ্টার শফীকুর রহমানের বাড়ীতে পৌঁছে যান। তার নানা আলহাজ্জ মাওলানা ইসমাঈল আলী দিল্লী থেকে পড়াশুনা করে এসে প্রথম এ গ্রামে আহলেহাদীছের দাওয়াত দেন। তিনিই গ্রামে প্রথম জামে মসজিদ ও ঈদগাহ কায়েম করেন। হানাফীরা বিদ্রুপ করে সেনগ্রামকে 'শিয়ালের টোক' বলত। কারণ মাওলানা ইসমাঈলই প্রথম ঈদের ছালাত ময়দানে পড়েন। ইতিপূর্বে সবাই মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করত। এ গ্রামে আহলেহাদীছদের জামে মসজিদ, ঈদগাহ ও একটি দাখিল মাদরাসা রয়েছে। ৩ জন কামিল পাস সহ মোট ৮ জন আলেম আছেন। তবে অনেকেই বাইরে চাকুরী-বাকুরী করেন। মাষ্টার শফীকুর রহমানই সর্বাধিক সক্রিয় ব্যক্তি এবং মসজিদ ও মাদরাসার সেক্রেটারী।

সেনগ্রামের অনুষ্ঠান শেষ করে গভীর রাতে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সফরসঙ্গীসহ সিলেট শহরে ফিরে আসেন এবং সহ-সভাপতি জনাব আব্দুছ ছবুরের বাসায় রাত্রি যাপন করেন।

২৪ শে ডিসেম্বর সোমবারঃ এদিন সকাল ৮-টা থেকে সাড়ে ৯-টা পর্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তিনি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। তন্মধ্যে জামা'আতে ইসলামীর রুকন ও থানা আমীর, তাবলীগ জামা'আতের যেলা আমীর ও সুনামগঞ্জের একজন স্বনামধন্য মুহাদ্দিছ-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের নিকটে তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও রূপরেখা ব্যাখ্যা করেন ও কিছু বই-পত্র হাদিয়া দেন। সকাল ১০-টায় তিনি 'সঊদী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ' কার্যালয়ে গমন করেন ও তাদের কর্মকর্তাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত ও মত বিনিময় করেন। সিলেট ভিত্তিক এই সংগঠনটি 'তাওহীদ' বিষয়ক প্রতিযোগিতা করে অনেকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। বর্তমানে এটি 'রাবেতা আলমে ইসলামী'র সহযোগী এনজিও হিসাবে কিছু কিছু সমাজ কল্যাণ মূলক কাজ করছে। এঁদের কোন মুখপত্র নেই। এখানে প্রথমে তাঁর নির্দেশক্রমে যুবসংঘের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মূলনীতি ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে ইসলামী সংগঠন সমূহকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি ইসলামী সংগঠন সমূহের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সৌজন্য সাক্ষাত, মত বিনিময় ও বিভিন্ন দ্বীনী অনুষ্ঠানে সফর বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক দূরত্ব কমিয়ে আনার পরামর্শ দেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ এনামুল হক্ব ওরফে মুহাম্মাদ চৌধুরী একই ধরনের মত প্রকাশ করেন ও আমীরে জামা'আতের বক্তব্যকে স্বাগত জানান।

এখানকার অনুষ্ঠান শেষ করে তিনি কানাইঘাট উপযেলাধীন গাছবাড়ী বাজারে অনুষ্ঠিতব্য সুধী সমাবেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। আজকের সফরসঙ্গী হিসাবে যুক্ত হন সিলেট শহরের প্রাচীন

আহলেহাদীছ পরিবারের প্রধান বন্দবাজার, লালদীঘির পাড় 'মুসলিম জুয়েলার্স'-এর মালিক শেখ মুহাম্মাদ ফীরোয (৬৩) ও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মুহাম্মাদ নাযীর (১৮) ও দৌহিত্র মুহাম্মাদ আসাদুযযামান (১৮)। শেখ ফীরোযের পিতা শেখ আব্দুল হান্নান জীবিকার সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী থেকে ১৯৩৭ সালে প্রথম সিলেট আসেন এবং ১৯৬০ সালে জমি কিনে বাড়ী করেন।

সিলেট শহর থেকে ৩৫ কিঃমিঃ দূরে সুরমা নদীর তীরে ঐতিহ্যবাহী গাছবাড়ী বাজার অবস্থিত। পূর্বতীরে গাড়ী রেখে নৌকায় শীর্ণকায় সুরমা নদী পেরিয়ে অপর পারে দীর্ঘ বাঁধানো ঘাট অতিক্রম করে তাঁরা গাছবাড়ী বাজারে পৌঁছেন। গাছবাড়ী 'আহলেহাদীছ পাঠাগারে'র সভাপতি তাজুল ইসলামের নেতৃত্বে তরুণ সদস্যরা এবং উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি মাষ্টার আবদুল মতীন সহ অন্যান্যরা নদী পারেই মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফর সঙ্গীদের সাদর অভ্যর্থনা জানান। বেলা দেড়টার দিকে তাঁরা স্থানীয় বাজারের দোতলা 'নূর মসজিদের' বিপরীতে মার্কেট-এর দোতলায় অবস্থিত 'আহলেহাদীছ পাঠাগারে' পৌঁছেন। প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত গাছবাড়ী বাজারে আহলেহাদীছ মালিকানাধীন ৫০টির মত দোকান রয়েছে। 'সেবা হোমিও ফার্মেসী'র মালিক ডাঃ আব্দুল জাব্বার (৫৫) বর্তমানে এখানকার একমাত্র আহলেহাদীছ স্থায়ী বাসিন্দা। বাজারের উপরে শতবর্ষ প্রাচীন গাছবাড়ী জামিউল উলূম কামিল মাদরাসাটি অবস্থিত। ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই মাদরাসার শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা ১৯০১-২০০০ এক কপি আমীরে জামা'আতকে হাদিয়া দেওয়া হয়। আহলেহাদীছ পাঠাগারের পরিচালক উৎসাহী তরুণরা প্রায় সবাই এ মাদরাসার ছাত্র। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস-এর সাবেক সহ-সভাপতি মাওলানা মোহাম্মাদ আলী (৭৩) এ মাদরাসাতেই দশ বছর শিক্ষকতা করেন।

কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ পাঠাগারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন গ্রামে স্থাপিত 'আহলেহাদীছ পাঠাগারে'র সংখ্যা ৬ টি। উদ্যোগী সবাই ছাত্র। সহযোগিতায় রয়েছেন বিভিন্ন পর্যায়ের সুধীবৃন্দ। তবে স্থানীয় হাইস্কুলের শিক্ষক মাষ্টার আব্দুল মতীন (৫১)-এর ভূমিকা সর্বাধিক। ইনি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি বর্তমানে ত্বায়েফে চাকুরীরত মুহাম্মাদ হারূণ-এর ছোট চাচা। পাঠাগারে আহলেহাদীছ-এর বই ছাড়াও অন্যান্য বইপত্র রয়েছে। হানাফী ছাত্র, শিক্ষক ও আলেমগণ উৎসাহ ভরে এখান থেকে বই নিয়ে পড়াশুনা করেন। ফলে 'আহলেহাদীছ' সম্পর্কে শিক্ষিত মহলের সংকীর্ণতা অনেক কমে গেছে। যার প্রমাণ পাওয়া গেল বাদ আছর পার্শ্ববর্তী 'সারমিন কমিউনিটি সেন্টারে' আয়োজিত সুধী সমাবেশে যথাসময়ে উপস্থিত মানুষের ঢল দেখে। সেন্টারে স্থান সংকুলান না হওয়ায় লোকেরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনেছেন। স্থানীয় রিপোর্ট অনুযায়ী শ্রোতাদের দুই তৃতীয়াংশ ছিলেন হানাফী এবং এলাকার নেতৃবৃন্দ। সুধী সমাবেশের বিশেষ অতিথি ছিলেন গাছবাড়ী কামিল মাদরাসার শিক্ষক ডঃ ইবরাহীম আলী। ইনি রিয়াদের জামে'আতুল ইমাম থেকে ডক্টরেট করেছেন ২০০০ সালে। এখানকার বর্তমান এম,পি জামা'আতে ইসলামীর জনাব ফরীদুদ্দীন চৌধুরী (সিলেট -৫)। উক্ত সংগঠনের স্থানীয় ইউনিটের আমীর সহ অনেকে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাত করেন।

গাছবাড়ী বাজারে কোন আহলেহাদীছ মসজিদ নেই। মসজিদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উক্ত কমিউনিটি সেন্টারের অনতিদূরে ক্রয়কৃত জমিতে আমীরে জামা'আতকে নিয়ে গেলেন মাষ্টার আব্দুল মতীন ও তাঁর সাথীবৃন্দ। সত্বর এটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদের নামে রেজিষ্ট্রি হবে বলে তিনি জানান।

সুধী সমাবেশঃ গাছবাড়ী বাজার 'সারমিন কমিউনিটি সেন্টারে' বিকাল ৪-টায় মাষ্টার আব্দুল মতীনের সভাপতিত্বে ও আহলেহাদীছ পাঠাগারের তরুণ নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় জমজমাট সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী (খতীব, বাংলাদুয়ার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, ঢাকা), মাওলানা আব্দুল মালেক (শিক্ষক, মাদরাসাতুল হাদীছ ও পেশ ইমাম নাযিরা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, ঢাকা) প্রমুখ। শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিলেট সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক জনাব মুনীরুল ইসলাম। অতঃপর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রথম যুগ্ম আহ্বায়ক ও স্থানীয় বাঁশবাড়ী গ্রামের কৃতি সন্তান মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী স্বীয় ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে অত্রাঞ্চলে আগমনের জন্য প্রাণভরা স্বাগত জানান ও নিজের সময়টুকু তাঁর জন্য উৎসর্গ করেন। অতঃপর বিশেষ অতিথির ভাষণে ডঃ ইবরাহীম আলী মুহতারাম আমীরে জামা'আতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ও ইসলামী নেতৃবৃন্দকে পারস্পরিক নছীহতের মন নিয়ে এভাবে কাছাকাছি হওয়ার আহ্বান জানান। সবশেষে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, আল্লাহ ও তাঁর সর্বশেষ রাসূলের আনুগত্য বিরোধী কোন কিছুই আল্লাহ্র নিকটে কবুল হবে না। তাই প্রগতির নামে হউক বা ইসলামের নামে হউক পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক সকল কর্মকাণ্ড থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে সত্যিকারের ইসলামী সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সকলকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারকে নিঃশর্ত ভাবে মেনে নেওয়ার একটি মাত্র শর্তেই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মুসলিম ঐক্য কামনা করে।

(পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্য)

সিলেট যেলা কর্মপরিষদ গঠন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শূরা সদস্যের সিলেট সফর

যেলা কর্মপরিষদ গঠন উপলক্ষে গত ২৩ শে নভেম্বর হ'তে ২৬শে নভেম্বর ২০০১ইং পর্যন্ত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ সিলেট যেলার বিভিন্ন এলাকা সফর করেন।

২৩ নভেম্বর বাদ জুম'আ তিনি সিলেট শহরের কোর্ট জামে মসজিদে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্জ শেখ মুহাম্মাদ ফীরোয-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'উপদেষ্টা পরিষদ' এবং 'আন্দোলন'-এর যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয়। অতঃপর বৈঠক শেষে তিনি নতুন কর্মপরিষদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

২৪ নভেম্বর বাদ যোহর সিলেটের জৈন্তাপুর থানাধীন সেনগ্রাম দাখিল মাদরাসা প্রাঙ্গনে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সিলেট যেলা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যয়নাল আবেদীনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় 'আমরা ৩টি কারণে আহলেহাদীছ আন্দোলন করি'-এ বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। তাঁর সফরসঙ্গী কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মাওলানা শামসুল হকও এ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

২৫ নভেম্বর তিনি সিলেটের জৈন্তাপুর থানার গাছবাড়ী বাজারস্থ 'আহলেহাদীছ পাঠাগার' মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। জনাব মাষ্টার আবদুল মতীন-এর সভাপতিত্বে এবং পাঠাগার সভাপতি মুহাম্মাদ তাজুল ইসলামের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও অন্যান্য আন্দোলনের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য সমূহ তুলে ধরে এক মনোজ্ঞ আলোচনা উপস্থাপন করেন। আলোচনা শেষে তিনি মানবতার মুক্তির জন্য সকলকে আহলেহাদীছ আন্দোলনে যোগদানের আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জনাব মাওলানা শামসুল হক্ব ও যেলা সহ-সভাপতি জনাব আবদুছ ছবূর চৌধুরী।

২৬ নভেম্বর বাদ ফজর তিনি গোয়ালজুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দা'ওয়াতে দ্বীনের গুরুত্বের উপর সারগর্ভ আলোচনা পেশ করেন।

যুবসংঘ

কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবে

সাতক্ষীরা ১৪ ডিসেম্বরঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে গত ১৪ই ডিসেম্বর ২০০১ 'ইসলামিক সেন্টার বাঁকাল' মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

মাননীয় প্রধান অতিথি 'ইসলামী আন্দোলনে কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এবং সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। বিশেষ অতিথি 'শাখা গঠনের পদ্ধতি' এবং অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম 'জামা'আতী যিন্দেগীর' গুরুত্বের উপরে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

পাঠ মত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীঃ কি, কেন এবং কারা?

সন্ত্রাস এমন এক কার্যকলাপের নাম, যার কারণে মানুষের মনে তীব্র অশান্তি, ক্ষোভ এবং সাংঘাতিক ভীতির উদ্রেক হয়। মানুষ সব সময় তটস্থ থাকে যে, হয়ত এখনই মৃত্যু দ্বার গোড়ায় হাযির হবে অথবা এমন এক বিপর্যয় ও ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হ'তে হবে, যেখান থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। এরূপ আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকাময় পরিবেশ ও পরিস্থিতির নামই সন্ত্রাস। এই অস্বাভাবিক সাংঘাতিক মৃত্যুর পরিবেশ সৃষ্টিকেই বলে সন্ত্রাসবাদ। আর এই সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীকে সন্ত্রাসী বলে আমরা বুঝে থাকি।

সন্ত্রাস সৃষ্টির অনেক কারণ আছে। কোন দেশে সুশিক্ষার অভাব, দারিদ্র, প্রতিহিংসা, স্বার্থোদ্ধার, উচ্চাকাংখা, প্রতিশোধ গ্রহণ, অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি কারণে কেউ কেউ সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত হয়। এগুলো খুব একটা সাংঘাতিক বলা যায় না। কারণ এ সমস্ত সন্ত্রাস সুশিক্ষা, সামাজিক প্রতিরোধ, বেকারত্ব দূরীকরণ ও কঠোর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব। কেননা এগুলি স্থানীয় কার্যকারণ থেকে উদ্ভূত। কিন্তু আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস প্রতিরোধ কঠিন বৈকি! কারণ এই সন্ত্রাস উৎপত্তির সঙ্গে শক্তিশালী, গোঁয়ার, দাম্ভিক, হৃদয়হীন নরপিশাচ, বর্বর, মানবতা বিরোধী, নিষ্ঠুর, নির্মম, আপোষহীন রাষ্ট্রীয় শক্তি জড়িত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়া চক্রান্ত করে জর্ডানের একাংশ তেলআবিবে বিশ্বাসঘাতক এবং অভিশপ্ত ইহুদীদের এনে বসায়। এই ইহুদীরা জার্মানীর অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ ও যুদ্ধকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল। ফলে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে জার্মানী হাযার হাযার ইহুদীদের হত্যা করে ও অনেককে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। এ ঘটনা সকলের জানা। তেলআবিবে ইহুদীদের ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ডের সহায়তায় পুনরায় জর্ডানের ফিলিস্তীন অংশ যুদ্ধ করে দখল করতঃ আজ পর্যন্ত সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। ইহুদীদের এই সন্ত্রাসী কাজের সহায়ক শক্তি হচ্ছে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড। জর্জ ডব্লিউ বুশ ও টনি ব্লেয়ার কি তা অস্বীকার করতে পারেন? মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তি ও সন্ত্রাসের মূল হোতাই হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।

অনুমানের উপর ভিত্তি করে বর্তমানে আফগানিস্তানে আক্রমণ করে নির্বিচারে নিরীহ বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের হত্যা করে চলেছে বর্বর আমেরিকা। অসহায়, দুর্বল ও গৃহযুদ্ধে লিপ্ত জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত একটি নিরপরাধ রাষ্ট্র আক্রমণ করে যুক্তরাষ্ট্র এক বিরাট সন্ত্রাসী রাষ্ট্র রূপে চিহ্নিত হয়েছে। আজ বিশ্ববাসী এই সন্ত্রাসী কার্যকলাপে বিচলিত। খেলাধূলা, আনন্দ-উৎসবেও মানুষ ভীত। আফ্রিকার সুদান ও নাইজেরিয়ায়ও অশান্তির মূল হোতা হচ্ছে সন্ত্রাসী যুক্তরাষ্ট্র। মধ্য এশিয়ায় সন্ত্রাসের মূল হোতা রাশিয়া বর্তমানে আদা খেয়ে সাধ বোঝার পর কিছুটা সংযত হ'লেও এখনো চেচনিয়ায় তারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অব্যাহত রেখে চেচেনদের স্বাধীনতাকে পর্যুদস্ত করে চলেছে।

ভারত উপমহাদেশ এক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং তারা অনেক শান্তিতে ছিল। কিন্তু সন্ত্রাসী বৃটিশ বেনিয়ারা রাজ্যগুলির মধ্যে বিভেদ, অশান্তি এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি ও শক্তি প্রয়োগ করে গোটা উপমহাদেশ দখল করে নেয়। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ ছেড়ে গেলেও বৃটিশরা মহাঅশান্তির বীজ বপন করে যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাজ্য কাশ্মীর এক সময় স্বাধীন ছিল এবং রাজা ছিল হিন্দু। তাই সে বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বাধীনভাবে না থেকে এবং প্রজাদের মতামত না নিয়েই ভারতের সঙ্গে যোগ দিলে যুদ্ধ বেঁধে যায়। ফলে কাশ্মীরের কিছু অংশ পাকিস্তান ও কিছু অংশ ভারত দখল করার ফলে উপমহাদেশ অশান্তির এক লীলাভূমিতে পরিণত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা এখন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত। অথচ এই সংগ্রামকে গায়ের জোরে ভারত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। ভারতের আসাম রাজ্যেও তদ্রূপ ভারত সরকার আসামীদের দমিয়ে রাখার জন্য দমন ও সন্ত্রাসের ঘৃণ্য নীতির আশ্রয় নিয়েছে। পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র ও তার সরকার কিংবা জাতিসংঘ কি এ সব অস্বীকার করতে পারে? যারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে তারা কি অশান্তির স্রষ্টা, না যারা তাদের দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছে তারা এ অশান্তির জন্য দায়ী? যখন শক্তিশালী প্রতিপক্ষ সম্মুখ যুদ্ধে পেরে উঠে না, ন্যায় বিচার পায় না তখনই উৎপীড়িতরা, অত্যাচারিতরা ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয় বা গুপ্ত হত্যা কিংবা সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যারা শক্তির বলে বলিয়ান, স্বাধীনচেতা জাতিকে নানা অত্যাচার, উৎপীড়ন, শক্তি প্রয়োগ করে এবং ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, তারাই বিশ্বব্যাপী অশান্তি ও সন্ত্রাসের হোতা। জাতিসংঘ ঐ সমস্ত ক্ষমতাধর সন্ত্রাসী রাষ্ট্রগুলির কাছে যিম্মী হয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে অনেক রাষ্ট্রইতো আছে, তাদের বিরুদ্ধে তো কেউ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাচ্ছে না। তাই সমস্ত অন্যায় অবিচারের ন্যায়সঙ্গত সমাধান হ'লে বিশ্বব্যাপী আর অশান্তি ও সন্ত্রাসের বিষবাষ্প থাকবে না।

মুহাম্মাদ মাযহারুল হান্নান
সহকারী শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত)
গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, রাজশাহী।

জেগে উঠতে ভয় কোথায়?

আমাদের অস্তিত্বের গোড়া খুঁড়লে জাতি হিসাবে বাঙ্গালী এবং সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমান ও হিন্দু এই দু'টি প্রধান সম্প্রদায় পাব। তাই আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে একটা মিশ্রণও পরিলক্ষিত হয়। আমাদের পূর্ণ নৈঃসর্গিকতার বেলাভূমি বাংলার হালচাল আজকাল কি রকম? সেটা কি বিতর্কিত? আমরা আমাদের চলচ্চিত্রের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখব- যা সম্পূর্ণ নাজায়েয তাই-ই প্রত্যেকটি পরতে পরতে। ঘরে বা ঘর ছেড়ে বাইরে বের হ'লে শুনি 'আস্সালামু আলাইকুম বেয়াইন সাব.....'। যেটার ভাব এবং কথা শুধু মনোত্তিক্ততারই উদ্রেক ঘটায় না, তা যেন চাপা দুঃসাহসিকতারও প্রতীক। এত কিছুর পরেও কেন যেন আমরা গতানুগতিকতার ধারায় মিশে যাই। আমি আমাদের সেঞ্চুর বোর্ডের কাছে নয়- যারা মানুষ, খেটে খাওয়া বাঙ্গালী, তাদের বুকে হাত রেখে মাসিক আত-তাহরীকে লেখার মাধ্যমে জানাতে চাই, আমরা কি এরকম সংস্কৃতিকে ভালবাসি? যদি না বাসি তবে কেন এই ঘুম? আসুন জেগে উঠি, ঝেড়ে ফেলি অশ্লীলতা, সব রকমের স্থূলতা। ছুটে চলি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পতাকা নিয়ে পরম সত্য, পরম আনন্দের পথে।

গোলাম রব্বানী
বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

একটি প্রশ্নের জবাবের প্রেক্ষিতে

জনাব প্রযোজক ছাহেব,

প্রযত্নেঃ আঞ্চলিক পরিচালক, ধর্মীয় ম্যাগাজিন, দৈনন্দিন জীবনে কুরআন, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

আসসালামু আলাইকুম, আমি সুযোগ পেলে ধর্মীয় ম্যাগাজিন, দৈনন্দিন জীবনে কুরআন অনুষ্ঠান শুনে থাকি। এতে আমি অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় পাই এবং সেই মোতাবেক আমল করার জন্য চেষ্টিত হই। প্রেরিত প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় কোন কোন প্রশ্নের উত্তর হাদীছ কুরআনের আলোকে না হয়ে প্রচলিত রেওয়াজ-রীতি বা রাষ্ট্রীয় আইনের অনুকূলে হয়ে যায়, যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ অনুষ্ঠানের নামের সাথে সঙ্গতি রেখেই উত্তর দেওয়াটা বাঞ্ছনীয়। আপনাদের সঠিক কথা জানা থাকা সত্ত্বেও মনে হয় কিছুটা ভয়ে উত্তর দিয়ে থাকেন। কিন্তু একথা আপনাদের অবশ্যই জানা আছে যে, 'যে ভাল কাজের সুপারিশ করবে, সে কাজের ছওয়াবের অংশ সে পাবে। আবার মন্দ কাজের সুপারিশ করলে সে মন্দ কাজের পাপের অংশও সে পাবে। এতে কারো ভাগে কম করা হবে না'।

গত ২ নভেম্বর তারিখের শুধু একটি বিষয়ই বলি। প্রশ্ন ছিল, 'বর ও কনে উভয়ের অভিভাবকেরই বিয়েতে সম্মতি নেই। কিন্তু বিয়েটা রেজিষ্ট্রি করে সম্পন্ন করা হয়েছে। বিয়েটা কি বৈধ হয়েছে?' উত্তরে বলা হয়েছেঃ 'বিয়েটা বৈধ হয়েছে। আর রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে করাটা রাষ্ট্রীয় আইন। তাই রেজিষ্ট্রি করতে হবে। অভিভাবকের সম্মতি থাকলে ভাল হ'ত'।

উত্তরটি রাষ্ট্রীয় আইনের অনুকূলে হয়েছে। রাষ্ট্রীয় আইন ইসলাম অনুমোদিত নয়। আমরা ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়েছি এবং আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের দাবীতে ভারত ভূমি দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। যে ঐতিহ্যের দাবীতে আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছিলাম, সে ঐতিহ্যের আলোকেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাটি চালু থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু তা না হ'লেও অন্ততঃ দেশের আলেম সমাজের এ ব্যাপারে একটা ভূমিকা থাকা উচিত।

উক্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর ছিল, বিয়েটা বৈধ হয়নি বলা। কারণ কনের অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া বিয়েটা ব্যভিচারের পর্যায়ে পড়ে। প্রিয় নবীজির কথার আলোকে আপনিও ব্যভিচারের অংশীদার হয়ে গেছেন। তাই রাষ্ট্রীয় আইনের আওতার কথা বলে নিজেদের বিপদগ্রস্ত করেছেন। দেশের শাসকবর্গকেও একথা স্মরণ রাখা দরকার, ইংরেজ শাসননীতি অপেক্ষা ইসলামী শাসননীতি অনেক উন্নতমানের। আমাদিগকে সে দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে হবে।

মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সাং- সন্ন্যাস বাড়ী, পোঃ বান্দাইখাড়া
যেলা- নওগাঁ।

শোওর

- দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/১০৬)ঃ 'মুক্বীম' অবস্থায় সাত ভাগে কুরবানী দেওয়া শরী'আত সম্মত কি-না ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ রেযাউল করীম
বাউসা সালাফী পাড়া, তেঁথুলিয়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'মুক্বীম' অবস্থায় ভাগে কুরবানী করার কোন বিধান শরী'আতে নেই। বরং একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করাই যথেষ্ট। তবে সামর্থ থাকলে একাধিক পশুও কুরবানী করতে পারবে। নিম্নে এ বিষয়ে দলীল সহ বর্ণনা করা হ'লঃ

(১) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা কালো দুম্বা আনতে বললেন, ... অতঃপর দো'আ পড়লেন,

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُّحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَّمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

'বিস্‌মিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদিন ওয়া মিন উম্মাতি মুহাম্মাদিন'

অর্থঃ আল্লাহ্‌র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তার উম্মাতের পক্ষ হ'তে। এরপর উক্ত দুম্বা কুরবানী করলেন *(ছহীহ মুসলিম, আলবানী- ছহীহ তিরমিযী হা/১২১০; ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৪২৩; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩১২৮; মিশকাত পৃঃ ১২৭, হা/১৪৫৪ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِى كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً

'হে জনমণ্ডলী! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী' *(সনদ হাসান, আলবানী- ছহীহ তিরমিযী হা/১২২৫; ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৪২১; ছহীহ নাসাঈ হা/৩৯৪০; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৫৩৩; মিশকাত হা/১৪৭৮)*।

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরেও তাঁর সুন্নাত অনুযায়ী ছাহাবীগণের মধ্যে প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে একটা করে বকরী কুরবানী করার প্রচলন ছিল। যেমন আতা ইবনে ইয়াসির ছাহাবী আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে বলেন,

كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّىْ بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُوْنَ وَيُطْعِمُوْنَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى-

'একজন লোক একটি বকরী দ্বারা নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ হ'তে কুরবানী দিতেন। অতঃপর তা খেতেন ও অন্যকে খাওয়াতেন এবং এভাবে লোকেরা বড়াই করত। এই নিয়ম নবীর যুগ হ'তে চলে আসছে। বর্তমানে তুমি যা দেখছ' *(ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৬ 'কুরবানী' অধ্যায়; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৫৩৩ 'নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটা বকরী কুরবানী করা' অনুচ্ছেদ, 'কুরবানী' অধ্যায়)*।

(৪) প্রখ্যাত ছাহাবী আবু ছারীহা (রাঃ) বলেন,

كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّوْنَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ-

অর্থঃ একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটা অথবা দু'টা করে বকরী কুরবানী করা হ'ত' *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৫৪৭)*।

(৫) আল্লামা শাওকানী উপরোক্ত পরস্পর তিন হাদীছ পেশ করে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন,

وَالْحَقُّ أَنَّهَا تَجْزِىُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَإِنْ كَانُوْا مِائَةَ نَفْسٍ أَوْ أَكْثَرُ كَمَا قَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ-

'হক কথা হ'ল, একটি পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি ছাগলই যথেষ্ট, যদিও সেই পরিবারের সদস্য সংখ্যা একশ' অথবা তার চেয়ে বেশী হয়' *(নায়লুল আওত্বার ৬/১২১ পৃঃ 'একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কুরবানী করাই যথেষ্ট' অনুচ্ছেদ)*।

(৬) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনও কখনও দু'টি দুম্বা কুরবানী করেছেন। যেমন- আনাস (রাঃ) বলেন,

ضَحَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাত দ্বারা দু'টি শিংওয়ালা দুম্বা কুরবানী করেছেন' *(ছহীহ বুখারী হা/৫৫৬৪-৬৫; ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৩ প্রভৃতি)*। কখনও তিনি দু-এর অধিক দুম্বা, খাসী, বকরী (ছাগল), গরু ও উট কুরবানী করেছেন *(ফাৎহুল বারী ১০/৯ পৃঃ ৫৭; মির'আত হা/১৪৭৪, ২/৩৫৪ পৃঃ)*।

ভাগে কুরবানীঃ সফরে থাকাকালীন সময়ে ঈদুল আযহা উপস্থিত হ'লে একটি পশুতে একে অপরে শরীক হয়ে ভাগে কুরবানী করা যায়। নিম্নে দলীল সহ বর্ণিত হ'ল-

(ক) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِى الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِى الْبَعِيْرِ عَشَرَةً-

অর্থঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাত জন একটি গরুতে ও দশ জন একটি উটে

শরীক হ'লাম *(আলবানী-ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৪; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩১২৮; ছহীহ নাসাঈ হা/৪০৯০; সনদ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৪৬৯ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*।

(খ) জাবির (রাঃ) বলেন,

نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ بِالْحُدَيْبِيَّةِ اَلْبُدْنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ –

'হুদায়বিয়ার সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তখন একটি গরুতে সাত জন ও একটি উটে সাত শরীক হয়ে কুরবানী করেছিলাম' *(ছহীহ মুসলিম হা/১৩১৮, 'হজ্জ' অধ্যায়; ছহীহ আবুদাউদ হা/২৪৩৫; ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৪; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩১৩২)*।

(গ) জাবির (রাঃ) বলেন,

حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَرْنَا الْبَعِيْرَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ –

'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন সাত জনের পক্ষ থেকে একটি উট এবং সাত জনের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেছিলাম' *(ছহীহ মুসলিম ২/৯৫৫ পৃঃ)*।

(ঘ) উক্ত জাবির (রাঃ) বলেন,

كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ–

'একদা আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন সাত জনে মিলে একটি গরু কুরবানী করেছিলাম' *(ছহীহ মুসলিম হা/১৩১৮ 'হজ্জ' অধ্যায়; ছহীহ নাসাঈ হা/৪০৯১; ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৪৩৩)*। উল্লেখ্য যে, জাবির (রাঃ) বর্ণিত এ মর্মের আরো হাদীছ রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে মুক্বীম ও মুসাফির অবস্থায় কুরবানী করার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

বিভ্রান্তির কারণঃ মুক্বীম অবস্থায় শুধু সাত জন মিলে নয়; বরং সাতটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করার প্রথা সমাজে চালু হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ জাবির (রাঃ) বর্ণিত নিম্নের ব্যাখ্যা শূন্য হাদীছটি, যা শুধু আবুদাঊদে বর্ণিত হয়েছে।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم اَلْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُوْرُ عَنْ سَبْعَةٍ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'একটি গরু সাত জনের পক্ষ থেকে ও একটি উট সাত জনের পক্ষ থেকে'। অথচ এই হাদীছটিও সফরে ভাগে কুরবানী করার সাথে সম্পৃক্ত। কারণ একই রাবী জাবির (রাঃ) থেকেই উপরোক্ত পরস্পর (খ, গ, ঘ নং) তিনটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ তথা সফরের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া দলীলের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে একই রাবীর বর্ণিত সংক্ষিপ্ত হাদীছের স্থলে বিস্তারিত ও ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছ গ্রহণ করাই মুহাদ্দিছগণের রীতি। **দ্বিতীয়তঃ** ইমাম আবুদাঊদ (রহঃ) উপরোক্ত খ ও ঘ নং ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছ দু'টি যে অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন, এই ব্যাখ্যা শূন্য হাদীছটিও ঐ অধ্যায়েই নিয়ে এসেছেন। অতএব বিভ্রান্তির কোন প্রশ্নই উঠে না। তাছাড়া ১ম হিজরী সনে কুরবানীর বিধান চালু হওয়ার পর মুক্বীম অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) ও তাঁরা ছাহাবীগণ ভাগে কুরবানী করেছেন বলে জানা যায় না।

প্রশ্নঃ (২/১০৭)ঃ 'ঈদুল ফিতর' ও ঈদুল আযহা' উভয় দিনেই কি তাকবীর পাঠ করতে হয়? ঈদের তাকবীর সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম
যোগীপাড়া, লক্ষণহাটী, নাটোর।

উত্তরঃ 'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আযহা' উভয় দিন তাকবীর পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় চাচা আব্বাস, চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, ফযল বিন আব্বাস, জামাতা আলী, তার ভাই জা'ফর, নাতি হাসান-হোসায়েন, গোলাম যায়েদ বিন হারেছা ও তৎপুত্র উসামা বিন যায়েদ প্রমুখ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দু'ঈদের দিন সকালে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর ও তাহলীল সহ ঈদগাহ অভিমুখে ঘর হ'তে রওয়ানা দিতেন ও এভাবে তিনি ঈদগাহ পর্যন্ত পৌঁছতেন *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল ৩/১২৩ পৃঃ, হা/৬৫০)*।

ঈদুল আযহা-তে আরাফার দিন বা ৯ই যিলহাজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহাজ্জ দিনের শেষ পর্যন্ত ২৩ ওয়াক্ত ছালাত শেষে ও অন্যান্য যেকোন সময়ে উচ্চকণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, সনদ ছহীহ, ইরওয়া ৩/১২৫ পৃঃ)*। ঈদুল ফিতর-এর ক্ষেত্রে তাকবীর বলার সময়সীমা হ'ল, শাওয়ালের চাঁদ দেখার পর হ'তে ঈদের দিনের শেষ পর্যন্ত *(তাফসীরে কুরতুবী ২/৩০৬-৭ পৃঃ)*। ইবনু উমর, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ বাজারে গমন করে তাকবীর ধ্বনি করতেন। লোকেরাও তাঁদের সাথে জোরে জোরে তাকবীর ধ্বনি করত *(ছহীহ বুখারী, ১/২৯২-৯৩ পৃঃ, 'ঈদায়েন' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নং ১১)*। মেয়েরাও সরবে (তবে উচ্চকণ্ঠে নয়) তাকবীর পাঠ করবেন *(তাফসীরে কুরতুবী ২/৩০৭ ও ৩/২-৩ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৭ পৃঃ)*।

তাকবীরের শব্দাবলীঃ প্রখ্যাত ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) তাকবীর দিতেন, 'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' আল্লা-হু আকবার- আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্‌দ' *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, সনদ ছহীহ, ইরওয়া ৩/১২৫ পৃঃ)*। ইবনুল মুবারক (রঃ) পড়তেন- 'আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, আল্লা-হু আকবর ওয়া লিল্লা-হিল হাম্‌দ, আল্লা-হু আকবর আলা মা হাদা-না'। অনেক বিদ্বান পড়েছেন, আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহা-নাল্লা-হি বুকরাতাওঁ ওয়া আসীলাহ' *(কুরতুবী ২/৩০৬-৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩/১০৮)ঃ ওশর-যাকাত আদায় না করলে কি সম্পদ ও শস্য হারাম হয়ে যাবে? ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-ফেরদাউস
পোঃ বক্স নং- ২৮১৩০, আবুধাবী।

উত্তরঃ 'যাকাত' ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আপনি তাদের সম্পদ হ'তে যাকাত গ্রহণ করুন, যাতে আপনি সেগুলিকে পবিত্র করতে এবং যাকাতের মাধ্যমে তাদের সম্পদ বরকতময় করতে পারেন' *(তওবা ১০৩)*। সুতরাং যাকাত বের না করলে শস্য ও সম্পদ অপবিত্র হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ (৪/১০৯)ঃ খুৎবা দেওয়ার সময় দু'হাত উঁচু করে খুৎবা দেওয়া যায় কি? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-যয়নুল আবেদীন
গ্রাম ও পোঃ নূরুল্লাহ বাদ, নওগাঁ।

উত্তরঃ খুৎবা দান কালে দু'হাত উঁচু করা ঠিক নয়। শুধুমাত্র শাহাদত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করা শরী'আত সমর্থিত। বিশর ইবনে মারওয়ান জুম'আর খুৎবা দান কালে দু'হাত উঁচু করেছিলেন। তখন ওমারা (রাঃ) বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা এই হাত দু'খানাকে ধ্বংস করুন। আমি রাসূল (ছাঃ)-কে খুৎবা দিতে দেখেছি তিনি হাত উঁচু করতেন না; বরং শাহাদত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করে বক্তব্য দিতেন *(মুসলিম, তিরমিযী হা/৫২০)*। আবুদাউদ শরীফে রয়েছে, ওমারা (রাঃ) বিশর ইবনে মারওয়ানের নিন্দা করার পর বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে মিম্বরের উপর বৃদ্ধাঙ্গুলের পাশের আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা ব্যতীত অন্য কিছু করতে দেখিনি *(ছহীহ আবুদাউদ হা/১১০৪)*।

প্রশ্নঃ (৫/১১০)ঃ জনৈক মহিলা তার স্বামীকে রেখে এক যুবকের সাথে পালিয়ে গিয়ে ভুয়া কাগজপত্র তৈরী করে 'খোলা তালাক' প্রমাণ করে ঐ যুবকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিছুদিন পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে ১ম স্বামীর নিকট ফিরে আসতে চায় এবং স্বামীও তাকে নিতে চায়। এক্ষণে ১ম স্বামীর নিকট ফিরে আসার শারঈ বিধান কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-সেলিম শাহ
মধ্য নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী পূর্ব স্বামীর সাথে উক্ত মহিলার তালাক হয়নি। ফলে উক্ত যুবকের সাথে তার বিবাহও শুদ্ধ হয়নি। যতদিন ঐ যুবকের সাথে থেকেছে ততদিন তারা ব্যভিচার করেছে। খোলা তালাকের নিয়ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যদি তোমরা আশংকা কর যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমা বজায় রাখতে পারবে না, তবে মেয়েটি বিনিময় দিয়ে মুক্ত হ'লে উভয়ের উপরে কোন দোষ নেই' *(বাক্বারাহ ২২৯)*। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে যা দিয়েছিল তা ফিরিয়ে দিয়ে স্বামীর নিকট হ'তে তালাক গ্রহণ করে নেওয়াই হচ্ছে 'খোলা তালাক'। খোলা তালাক হওয়ার পর স্ত্রীকে ১ ঋতু পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে। এরপর অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে *(নায়ল ৬/২৫৯)*। এক্ষণে ১ম স্বামী তাকে বিনা বিবাহে ফিরিয়ে নিতে পারবে। কেননা খোলা তালাক হয়ে থাকলে নতুন বিবাহের প্রয়োজন হ'ত।

প্রশ্নঃ (৬/১১১)ঃ কতিপয় দাঈকে দেখা যায় কর্কশভাষী ও রূঢ় মেজাযের। ফলে সমাজে তাদের বক্তৃতায় তেমন প্রভাব পড়ে না। দা'ওয়াত দাতা কেমন গুণের অধিকারী হবেন? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নঈমুদ্দীন মাষ্টার
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ দাঈ'র প্রধান যে গুণটি থাকা দরকার সেটি হচ্ছেঃ নম্র, ভদ্র ও সর্বপ্রকার রূঢ়তা থেকে মুক্ত থাকা। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'আল্লাহ্র অনুগ্রহ যে, আপনি লোকদের প্রতি খুবই বিনম্র। নতুবা আপনি যদি পাষাণাত্মা ও রূঢ় ব্যবহারকারী হ'তেন তবে এসব লোক আপনার চতুষ্পার্শ্ব থেকে সরে যেত' *(আলে ইমরান ১৫৯)*। **দ্বিতীয়তঃ** সকল বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বলুন! ইহাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র পথে, জাগ্রত জ্ঞান সহকারে' *(ইউসুফ ১০৮)*। **তৃতীয়তঃ** ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) অনেক নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করেছেন। কিন্তু তিনি সেগুলিকে কিছু মনে না করে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। এরপরও তিনি প্রার্থনা করেছেন, 'হে আল্লাহ! আমার সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান কর। কেননা তারা অজ্ঞ' *(ডঃ মাহদী রিযকুল্লাহ, আস-সীরাতুন নববিইয়াহ আলা যাওয়িল মাছাদিরিল আছলিইয়া ১৫৫ পৃঃ)*। সুতরাং প্রত্যেক দাঈ-র জন্য উপরোল্লিখিত গুণাবলী অর্জন করা আবশ্যক। কর্কশ ভাষা, রূঢ় আচরণ অবশ্যই বর্জনীয়।

প্রশ্নঃ (৭/১১২)ঃ শীতকালে রাতে ঘর গরম করার জন্য আগুন জ্বালিয়ে ঘুমানো কি জায়েয? ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আতাউল্লাহ শেখ
নাযিরা বাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ ঘরে আগুন জ্বালিয়ে ঘুমাতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা ঘুমানোর সময় তোমাদের বাড়ীতে আগুন জ্বালিয়ে রেখো না' *(বুখারী ১১/৭১ পৃঃ; মুসলিম হা/২০১৫)*। অন্য হাদীছে এসেছে, এক রাতে মদীনায় একটি বাড়ী পুড়ে গেলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই এ আগুন তোমাদের শত্রু। সুতরাং যখন তোমরা ঘুমাবে, তখন আগুন নিভিয়ে ঘুমাবে *(বুখারী ১১/৭১ পৃঃ; মুসলিম হা/২০১৬)*। অপর এক হাদীছে আছে, তোমরা বাতি নিভিয়ে ঘুমাবে *(মুসলিম হা/২০১২)*।

প্রশ্নঃ (৮/১১৩)ঃ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে পার্থক্য কি? সবগুলিই দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য নয় কি? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-শহীদ আখতার
পুরানা মোগলটুলী, ঢাকা।

উত্তরঃ সন্তান-সন্ততি হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত বা বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য ও সুখ-শান্তির উপাদান ও বাহন' *(কাহফ ৪৬)*।

ধন-সম্পদ হচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর উপায়। আর সন্তান-সন্ততি হচ্ছে বংশ তথা মানব প্রকৃতি রক্ষার মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজস্ব প্রজাতি থেকেই জুড়ি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের এই জুড়ি থেকেই তোমাদের জন্য সন্তান-সন্ততি ও পৌত্র-পৌত্রী বানিয়ে দিয়েছেন' *(নাহল ৭২)*।

স্বামী ও স্ত্রীর আবেগ-উচ্ছাসপূর্ণ প্রেম-ভালবাসা পরিপূর্ণতা লাভ করে এ সন্তানের মাধ্যমে। সন্তান হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের নিষ্কলংক পুষ্প বিশেষ। সুতরাং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে পার্থক্য হ'ল প্রাণ রক্ষার মাধ্যম ও বংশ রক্ষার মাধ্যম।

প্রশ্নঃ (৯/১১৪)ঃ রামাযান মাসের শেষ জুম'আয় সম্মিলিতভাবে কবর যিয়ারত করা এবং হাত উঠিয়ে দো'আ করার প্রথা আমাদের এলাকায় চালু আছে। এ ধরনের কবর যিয়ারত কি শরী'আত সম্মত?

-হেলালুদ্দীন সরকার
রেল বাজার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ উপরোক্ত পদ্ধতিতে কবর যিয়ারত করা শরী'আত সম্মত নয়। বরং নির্দিষ্ট কোন দিন বা রাত নির্ধারণ না করে যে কোন সময় কবরের পাশে গিয়ে কবরবাসীর জন্য একাকী হাত তুলে দো'আ করা যায়। নবী করীম (ছাঃ) 'বাক্বীউল গারক্বাদে' গিয়ে কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে একাকী হাত তুলে দো'আ করতেন' *(মুসলিম ১/৩১৩ পৃঃ 'জানাযা' অধ্যায়, 'কবরবাসীদের সালাম ও তাদের জন্য দো'আ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১০/১১৫)ঃ 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' অবতীর্ণ হওয়ার কারণ কি? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মেহের আলী মণ্ডল
ঝাউতলী, দাউদকান্দী, কুমিল্লা।

উত্তরঃ দু'টি সূরার মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করার জন্যই মূলতঃ 'বিস্‌মিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' নাযিল করা হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সূরার পার্থক্য বুঝতে পারেননি' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৮৮)*।

প্রশ্নঃ (১১/১১৬)ঃ বড় ভাইয়ের কন্যার কন্যাকে অর্থাৎ বড় ভাইয়ের নাতনীকে বিবাহ করা যাবে কি? সঠিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-হাসীনুর রহমান
গান্ধাইল, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ আপন ভাতিজীর কন্যাকে বিবাহ করা হারাম। ইসলামে যে ১৪ জন মহিলা ও তার শাখা-প্রশাখাকে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে ভাতিজীর কন্যাও তার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা অর্থাৎ মাতার মাতা তার মাতা এভাবে উপর দিকে যতদূর পর্যন্ত পৌঁছবে, তোমাদের কন্যা অর্থাৎ কন্যার কন্যা তার কন্যা এভাবে নীচে যতদূর পৌঁছবে, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাতৃকন্যা অর্থাৎ তার কন্যা তার কন্যা এই ভাবে যত নীচে যাবে...' *(নিসা ২৪; তাফসীরে ইবনে কাছীর দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১২/১১৭)ঃ জনৈক ছাত্র কোন এক বাড়ীতে লজিং থাকা অবস্থায় লজিং বাড়ীর মহিলার সাথে খালা সম্পর্ক স্থাপন করে। খালা ঐ ছেলের সাথে সফর করতে পারবে কি-না ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- মেহরাব হোসাইন
নাচোল বাজার, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ শরী'আতে আপন খালা ছাড়া আর কোন খালা নেই। সুতরাং যাদেরকে বিবাহ করা হারাম উক্ত খালা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই তার সাথে একাকী সফর করা যাবে না। কেননা উক্ত ছেলে মুহরাম নয় (যাদের সাথে বিবাহ হারাম)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে যেতে পারে না এবং কোন মহিলা মুহরাম ব্যতীত সফর করতে পারবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১৩ 'হজ্জ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১১৮)ঃ সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে মৃত বল না; বরং তারা জীবিত। তারা তাদের প্রভুর নিকটে রিযিক পেয়ে থাকে'। উল্লেখিত আয়াতে রিযিক বলতে কি দুনিয়াবী রিযিক বুঝানো হয়েছে, না আখেরাতের রিযিক বুঝানো হয়েছে? ছহীহ সুন্নাহভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মাওলানা আব্দুল হান্নান
বাগীপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আল্লাহ সংবাদ দিচ্ছেন যে, শহীদগণ তাদের বরযখী জীবনে (মৃত্যু পরবর্তী জীবনে) জীবিত থাকেন ও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রিযিক প্রাপ্ত হন। অতঃপর দলীল হিসাবে তিনি ছহীহ মুসলিম থেকে হাদীছ পেশ করেছেন, যেখানে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই শহীদদের রূহগুলি সবুজ রংয়ের পাখি সমূহের পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে জান্নাতের যে কোন স্থানে ইচ্ছামত বিচরণ করে...। শহীদদের উচ্চ মর্যাদা দেখে তারা আল্লাহ্‌র আরশের নিকটে গিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এসে জিহাদ করে শহীদ হওয়ার আকাংখা ব্যক্ত করবে। কিন্তু আল্লাহ বলেন, এটাই চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে যে, তাদেরকে আর ফেরত পাঠানো হবে না' *(তাফসীর ইবনে কাছীর ১/২০৩ পৃঃ)*। উল্লেখিত দলীলের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যুর পরে মানুষের জন্য নতুন জীবন আরম্ভ হয়। সেই বরযখী জীবনের উপলব্ধি ও রিযিক প্রদান সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রবৃত্তির, যা দুনিয়াবী জীবনে বসে অনুভব করা সম্ভব নয়।

প্রশ্নঃ (১৪/১১৯)ঃ জনৈক মহিলা স্বামীর উপর অভিমান করে আত্মহত্যা করার কারণে তার জানাযার ছালাত কেউ পড়েনি। গ্রামবাসীরা কাজটি কি ঠিক করেছেন? ছহীহ হাদীছভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল ওয়াদূদ
জোত খামার, লালগোলা বাজার, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ রাসূল (ছাঃ) কোন ঋণগ্রস্ত ও আত্মহত্যাকারীর জানাযা নিজে পড়তেন না। কিন্তু ছাহাবীদেরকে পড়তে বলতেন' *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৮৫১-১৮৫৬)*। সুতরাং কোন আলেম নিজে জানাযা না পড়িয়ে অন্য কোন সাধারণ মানুষ দ্বারা উক্ত মহিলার জানাযা পড়ানো উচিৎ ছিল।

প্রশ্নঃ (১৫/১২০)ঃ কোন এক মসজিদে দেখলাম মসজিদের ময়লা ফেলার জন্য মসজিদের ভিতরের এক কর্ণারে ডাষ্টবিন রাখা আছে। মসজিদের ভিতরে এরূপ ডাষ্টবিন স্থাপন কি জায়েয? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- মেছবাহুল ইসলাম
চাকলা, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করতে এবং উহাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় করে রাখতে বলেছেন' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৭১৭ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'মসজিদে পেশাব করা ও আবর্জনা ফেলা জায়েয নয়। মসজিদ হচ্ছে আল্লাহ্র যিকির ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্য' *(মুসলিম, ফিকহুস সুন্নাহ ১/২১১ পৃঃ 'মসজিদ' অনুচ্ছেদ)*।

দলীল সমূহের আলোকে এ কথা বলা যায় যে, মসজিদে কোনক্রমেই আবর্জনা রাখার জন্য ডাষ্টবিন রাখা শরী'আত সমর্থিত নয়। মসজিদের বাইরে যে কোন স্থানে ডাষ্টবিন স্থাপন করতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৬/১২১)ঃ ছালাতে থুথু ফেলার প্রয়োজন হ'লে সামনে না ফেলে বামে অথবা পায়ের নীচে ফেলার নির্দেশ কেন? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-জমসেদ আলী
ভূষণছড়া, বরকল, রাঙ্গামাটি।

উত্তরঃ মুছল্লী যখন ছালাতে থাকে, তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে চুপে চুপে কথা বলে। সেকারণ ডানে বা সামনে থুথু ফেলা নিষেধ। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন তোমাদের কেউ ছালাতে থাকে, তখন সে তার রবের সাথে চুপে চুপে কথা বলে। সে যেন সামনে ও ডান দিকে থুথু নিক্ষেপ না করে। তবে বাম দিকে ও পায়ের নীচে নিক্ষেপ করতে পারে' *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/২৪২)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১২২)ঃ সিল্কের পাঞ্জাবী, শাড়ী প্রভৃতি ব্যবহার করা যাবে কি-না ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল খালেক
মল্লিকপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'সিল্ক' ইংরেজী শব্দ যার অর্থ 'রেশম'। রেশম-এর তৈরি কাপড় পরিধান করা পুরুষের জন্য হারাম ও নারীদের জন্য হালাল। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমার উম্মতের পুরুষদের উপর রেশম-এর কাপড় ও স্বর্ণ হারাম করা হয়েছে এবং নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে' *(তিরমিযী ১/১৩২ পৃঃ; নাসাঈ ২/২৮৫ পৃঃ; আহমাদ ৪/৩৯৪ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১২৩)ঃ নর্তকীদেরকে এবং তাদের নাচ দেখা শরী'আতের দৃষ্টিতে কেমন অপরাধ? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-খালেদ
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ নর্তকীদেরকে এবং তাদের নৃত্য পরিদর্শন করা ইসলামী শরী'আতে গর্হিত অপরাধ। কেননা নৃত্য অশ্লীল কর্ম সমূহের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী! আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীল কর্মকে হারাম করেছেন' *(আ'রাফ ৩৩)*। 'তোমরা অশ্লীল কর্মের নিকটবর্তী হবে না' *(আন'আম ১৫১)*। 'যারা নর্তকীদের ক্রয় করে আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে, তাদের জন্য অপমানজনক শাস্তি রয়েছে' *(লোকমান ৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা নর্তকীদের বিক্রি করো না, তাদের ক্রয় করো না এবং তাদেরকে নৃত্য শিক্ষা দিয়ো না। তাদের উপার্জন হারাম' *(আহমাদ, ছহীহ তিরমিযী হা/১০৩১৩; মিশকাত হা/২৭৮০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। এতদ্ব্যতীত নর্তকীদের নৃত্য পরিদর্শন যেনার সমতুল্য। কেননা রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'দু'চোখের যেনা হচ্ছে চোখের দর্শন, আর দু'কানের যেনা হচ্ছে কানের শ্রবণ' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৬ 'তাক্বদীরের প্রতি ঈমান' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/১২৪)ঃ ঈদের ছালাত আদায় শেষে পরস্পরে কোলাকুলি করা যাবে কি-না দলীলভিত্তিক জানতে চাই।

-শরীফুল ইসলাম
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঈদের ছালাত শেষে কোলাকুলি করার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। তবে আগন্তুক ব্যক্তির সাথে কোলাকুলি করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ পরস্পর সাক্ষাতে মুছাফাহা করতেন আর সফর থেকে আসলে কোলাকুলি করতেন *(তাবারানী আওসাত, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহা ১/২৫২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২০/১২৫)ঃ ৬০ বছর বয়সের জনৈক হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে খাৎনা করতে লজ্জাবোধ করছে। খাৎনা না করলে মুসলমান হওয়া যাবে কি? ছহীহ সুন্নাহভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-যাকির হোসাইন
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ খাৎনা করা সুন্নাত। যা হযরত ইবরাহীম (আঃ) থেকে চলে আসছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ইবরাহীম (আঃ) ৮০ বছর বয়সে খাৎনা করেছিলেন' *(বুখারী, মুসলিম, নায়ল 'খাৎনা' অনুচ্ছেদ ১/১১১ পৃঃ)*।

উপরোল্লিখিত হাদীছ থেকে জানা যায় যে, ইবরাহীম (আঃ) ৮০ বছর বয়সে খাৎনা করতে লজ্জাবোধ করেননি। অতএব ৬০ বছর বয়সে খাৎনা করতে লজ্জাবোধের কোন কারণ নেই। তবে খাৎনা না করলে মুসলমান হওয়া যায় না কথাটি ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (২১/১২৬)ঃ আমরা জানি যে, ঘুম থেকে উঠে হাত ধৌত না করে পাত্রে প্রবেশ করাতে হাদীছে নিষেধ করা হয়েছে। তবে কি টিউবওয়েলে ওযূ করলেও প্রথমে হাত ধৌত করতে হবে?

-আব্দুল আলীম
বিভাগদা, যশোর।

উত্তরঃ ঘুম থেকে ওঠে হাত ধৌত না করে পানির পাত্রে হাত প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা মূলতঃ পানির পবিত্রতা রক্ষার্থে করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, তখন সে যেন তার হাত ধৌত না করে পানির পাত্রে না ডুবায়। কেননা সে জানে না রাতে তার হাত কোথায় কোথায় লেগেছিল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/৩৯১)*। অর্থাৎ ঘুমন্ত অবস্থায় তার হাত শরীরের কোন অপবিত্র স্থানে লাগতে পারে এবং সে অপবিত্র বস্তু পাত্রের পানিতে মিশলে পানি অপবিত্র হয়ে যাবে এই আশংকায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। এক্ষণে টিউবওয়েল, ছোট পাত্র (যে পাত্র থেকে ঢেলে ওযূ করা হয়) অথবা চলমান পানিতে ওযূ করলে পৃথকভাবে আগে হাত ধৌত করার প্রয়োজন নেই। এতদ্ব্যতীত অন্য যে সকল পাত্রে হাত ডুবিয়ে ওযূ করা হয় সেক্ষেত্রে উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে।

প্রশ্নঃ (২২/১২৭)ঃ ছোট ছেলেরা জামা'আতের প্রথম কাতারে অথবা বড়দের কাতারের মাঝখানে দাঁড়াতে পারে কি?

দ্বীন ইসলাম
ইমাম, মসজিদে ফেরদাউস
ঝিকর কলেজ পাড়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ছোট ছেলেরা প্রথম কাতারে অথবা বড়দের কাতারের মাঝে দাঁড়াতে পারবে না মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। তবে জ্ঞানী ও সম্মানী ব্যক্তিদের সামনের কাতারে ধারাবাহিক ভাবে দাঁড়ানোর কথা হাদীছে এসেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে বয়স্ক জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আমার পাশে দাঁড়াবে। অতঃপর তাদের পাশে দাঁড়াবে এর চেয়ে কম জ্ঞানীগণ, এরপর তারচেয়ে কম জ্ঞানীগণ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৮)*।

প্রকাশ থাকে যে, প্রথমে বড়রা দাঁড়াবে তারপর ছোটরা দাঁড়াবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। এ হাদীছে শহর ইবনে হাওশাম নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১১৫-এর টীকা, পৃঃ ৩৪৮)*। অনুরূপ আরেকটি দুর্বল সূত্রে বলা হয়েছে যে, ওমর (রাঃ) কোন ছেলেকে কাতারে দেখলে বের করে দিতেন' *(আউনুল মা'বূদ, ২/৩৬৪ পৃঃ 'কাতারে বাচ্চাদের দাঁড়ানো' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১২৮)ঃ 'রাসূল (ছাঃ) রোদের মধ্যে পথ চললে তাঁর শরীরে রোদ লাগত না, এক খণ্ড মেঘ তাঁকে ছায়া করে থাকত' এ কথা কি সঠিক?

-আহসান
লালবাগ, নাটোর।

উত্তরঃ 'রাসূল (ছাঃ)-এর শরীরে কোন সময় রোদ লাগত না বা পথ চললে সর্বদা মেঘ ছায়া করে থাকত' মর্মে কোন হাদীছ নেই। তবে কখনো কখনো মেঘ, পাথর, গাছ ইত্যাদি তাঁকে ছায়া করত। আবু বকর (রাঃ) বলেন, আমরা একদিন মদীনার পথ চলতে চলতে দুপুর হ'লে একটা লম্বা পাথর আমাদের উপর তুলে ধরা হ'ল, যার ছায়া ছিল, আমরা সে ছায়ায় অবতরণ করলাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/ ৫৮৬৯)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি আকাবার দিন আলী ইবনে আবদে ইয়ালীল ইবনে কোলালকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলে সে আমার দা'ওয়াত গ্রহণ করেনি। তখন আমি চিন্তিত হয়ে পথ চলতে লাগলাম। অতঃপর আমি সা'আলীব নামক স্থানে পৌঁছে দেখি একখণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া করে আছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৪৮)*।

প্রশ্নঃ (২৪/১২৯)ঃ 'রাসূল (ছাঃ)-কে আগে সালাম করার জন্য কেউ কেউ গোপনে পিছন দিক হ'তে আসত। কিন্তু তবুও সফল হ'তে পারত না। কেননা তিনি সম্মুখে, পশ্চাতে সমভাবেই দেখতেন'। আলোচ্য বক্তব্য কি সঠিক? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- নু'মান
দাউকান্দী, মোহনপুর
রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লিখিত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং ছালাত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) সম্মুখ ও পশ্চাতে সমভাবে দেখতেন। তবে তাঁর পিছন দিকে চোখ ছিল এমনটি নয়। বরং এটা ছিল তাঁর মু'জেযা বা অলৌকিক ক্ষমতা। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে যোহরের ছালাত আদায় করালেন। এক লোক পিছনের কাতারগুলিতে খারাপ কিছু ঘটিয়েছিল। রাসূল (ছাঃ) সালাম ফিরায়ে তাকে ডেকে বললেন, 'তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর না? তুমি বুঝ না কিভাবে ছালাত আদায় করছ? নিশ্চয়ই তোমরা মনে কর যে, তোমাদের কর্ম কেবল আমার সামনে গোপন থাকে। আল্লাহ্র কসম, নিশ্চয়ই আমি সামনে যেমন দেখি, পিছনেও তেমনি দেখি' *(আহমাদ, সনদ ছহীহ মিশকাত, হা/৮১১)*। ছহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় এসেছে, 'আল্লাহ্র কসম, ছালাতের মধ্যে তোমাদের বিনয়-নম্রতা এবং তোমাদের রুকূ আমার সামনে গোপন থাকে না। আমি তোমাদেরকে আমার পিছন থেকে দেখতে পাই' *(মিশকাত, পৃঃ ২৫৫)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'তোমরা রুকু-সিজদা ঠিকভাবে কর, আল্লাহ্র কসম আমি তোমাদেরকে আমার পিছন থেকে দেখতে পাই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/৮৬৮)*।

প্রশ্নঃ (২৫/১৩০)ঃ বিতর ছালাতে দো'আয়ে কুনূত পড়া কি আবশ্যক? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুঈনুদ্দীন আহমাদ
মহানন্দাখালী, রাজশাহী

উত্তরঃ বিতর ছালাতের জন্য দো'আয়ে কুনূত পড়া আবশ্যক নয়; বরং সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় নাতি হাসান ইবনে আলীকে বিতর ছালাতে পড়ার জন্য দো'আয়ে কুনূত শিখিয়েছিলেন' *(তিরমিযী, নাসাঈ সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১২৭৩)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১৩১)ঃ তাহাজ্জুদ পড়ার আশায় বিতর পড়িনি। ঘুম থেকে ওঠে দেখি সকাল হয়ে গেছে। এখন আমার করণীয় কি?

-ফারহানা
নোয়াগাঁও, আড়াইহাযার
নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি যদি বিতর ছালাত বাকী রেখে ঘুমিয়ে যায় অথবা বিতর আদায়ে ভুলে যায়, তাহ'লে যখন ঘুম ভাঙ্গবে অথবা স্মরণ হবে তখন বিতর ছালাত আদায় করে নিবে *(আবুদাঊদ, ইরওয়া, হা/৪৪২)*। অন্য বর্ণনা মতে, কেউ যদি তার রাতের নির্ধারিত ইবাদত আদায় না করতে পারে তাহ'লে ফজর ও যোহরের ছালাতের মাঝে আদায় করলে তাকে রাতে আদায়ের নেকী প্রদান করা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত, হা/১২৪৭)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১৩২)ঃ আমাদের গ্রামের এক মহিলাকে জিনে ধরেছে। মেয়েটিকে জিন বিয়ে করতে চায়। আমার প্রশ্নঃ জিন কি মানুষকে ধরতে পারে এবং বিয়ে করতে পারে?

-এনামুল হক্ব
দাউকান্দী, রাজশাহী।

উত্তরঃ শয়তান জিন মানুষকে ধরে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী! আপনি শয়তান জিন ও মানুষের অনিষ্ট হ'তে পরিত্রাণ চান' *(সূরা নাস)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সন্ধ্যার সময় তোমরা তোমাদের বাচ্চাদেরকে ধরে রাখ, কেননা ঐ সময় জিন ছড়িয়ে পড়ে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৯৫)*। উপরোক্ত দলীল থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিন মানুষের ক্ষতি করতে পারে। তবে জিনের সাথে মানুষের বিবাহ সম্পর্কে শরী'আতে কোন আলোচনা নেই। তাছাড়া জিন আগুনের তৈরী, আর মানুষ মাটির তৈরী' *(আ'রাফ ১২)*। কাজেই উভয় জাতির মধ্যে বিবাহের কোন প্রশ্নই আসে না।

প্রশ্নঃ (২৮/১৩৩)ঃ মসজিদ ও মাদরাসার নামে ব্যাংকে সংরক্ষিত টাকার বর্ধিত অংশ বা সুদ উক্ত প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা যাবে কি? যদি না যায় তাহ'লে উক্ত সুদের টাকার ব্যবস্থা কি হবে?

- মুহাম্মাদ হাফীযুদ্দীন
আত্তা নারায়নপুর, গোছা
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ সুদ এমন একটি জঘন্য অপরাধ যা চিরতরে দমন করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সুদ মানুষের অর্থকে সংকুচিত করে দেয়' *(বাক্বারাহ ২৭৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুদ দাতা, গ্রহীতা, সুদের লেখক ও সাক্ষীর উপর লা'নত করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) এক দেরহাম সুদকে ৩৬ বার যেনা করার চেয়েও কঠিন বলে উল্লেখ করেছেন *(আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৮২৫ 'সূদ' অনুচ্ছেদ)*।

অতএব মসজিদ, মাদরাসা ও অন্য যেকোন প্রতিষ্ঠানের অর্থ সুদী ব্যাংকে অথবা সুদ নেয়ার আশায় কোন ব্যাংকে রাখা যাবে না।

মাদরাসা বা অন্য কোন দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের পূর্বের রক্ষিত টাকার সুদ উক্ত প্রতিষ্ঠানে অথবা সমাজ কল্যাণ মূলক কোন কাজে ব্যয় করা যাবে। তবে মসজিদে ব্যবহার করা যাবে না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তির ব্যাংকে রক্ষিত টাকার সুদ দায়মুক্ত হওয়ার জন্য কোন দ্বীনি কাজে ব্যবহার করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা ভাল কাজে ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপের কাজে ও সীমালংঘনের ব্যাপারে সহায়তা করো না' *(মায়েদাহ ২)*। তবে ঐ অর্থ খরচে কখনো নেকীর আশা করা যাবে না। কারণ অবৈধ অর্থ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে কোন নেকী পাওয়া যায় না *(আহমাদ, মিশকাত হা/২৭৭১)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১৩৪)ঃ আমরা জানি যে, মৃত্যুর সময় কালিমা পড়লে জান্নাতী হওয়া যায়। কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় মারা গেলে কালেমা পড়ার সুযোগ থাকে না। তাই ঘুমানোর সময় কালেমা পড়ে ঘুমালে ঐ হাদীছের আওতাভুক্ত হওয়া যাবে কি?

- আবুল কাসেম, কুয়েত।

উত্তরঃ রাসূল (ছাঃ) মুমূর্ষু অবস্থায় কালিমা স্মরণ করানোর জন্য বলেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৬)*। এ কালিমা পাঠকারীকে জান্নাতী বলেও ঘোষণা করেছেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩১১৬; মিশকাত হা/১৬২১)*। তবে ঘুমানোর সময় এ কালেমা পড়ার কথা বলা হয়নি। সুতরাং মৃত্যুর সময়ের ফযীলত লাভের আশায় ঘুমানোর সময় কালেমা পাঠ করা যাবে না। বরং ঘুমানোর সময় যে দো'আ পড়ার কথা এসেছে ঐ দো'আগুলি পড়েই ঘুমাতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩০/১৩৫)ঃ কোদালকাটি, চাঁপাই নবাবগঞ্জে জনৈক মহিলা মারা গেলে তিনটি কাফনের কাপড় পরিয়ে তার দাফন-কাফন সম্পন্ন করা হয়। এতে কতিপয় লোকের মাঝে মতানৈক্য দেখা দেয়। ছহীহ দলীলের আলোকে এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
দিয়াড় মানিক চক
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত মহিলাকে তিন কাপড়ে দাফন করাই সঠিক হয়েছে। কেননা পুরুষ ও মহিলার মাঝে কাফনের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে তিনটি ইয়ামানী সাদা সূতী কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল। যাতে জামা ও পাগড়ী ছিল না *(বুখারী, মুসলিম,*

মিশকাত হা/১৪৩, 'জানাযা' অধ্যায়)।

মহিলাদেরকে পাঁচটি কাপড়ে কাফন দেওয়ার যে প্রথা সমাজে চালু আছে তার প্রমাণে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ *(যঈফ আবুদাঊদ হা/৬৯১)*।

সুতরাং ছহীহ হাদীছের উপর আমল করার নিমিত্তে মহিলা ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য না করে তিনটি কাপড়ে সবাইকে দাফন করতে হবে *(মির'আত 'জানাযা' অধ্যায় ২৪৩-২৪৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১৩৬)ঃ বাচ্চা জন্মের পর সাত দিনের পূর্বে মারা গেলে ঐ বাচ্চার আক্বীক্বা দিতে হবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ বাচ্চা জন্মের পর সাত দিনের পূর্বে মারা গেলে তার আক্বীক্বা দিতে হবে না। কারণ নবী করীম *(ছাঃ)* বাচ্চার জন্মের পর সপ্তম দিনে আক্বীক্বা নির্ধারণ করেছেন *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪১৫৩ 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ, ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৫৮০)*। ইমাম শাওকানী বলেন, সাত দিনের পূর্বে বাচ্চা মারা গেলে আক্বীক্বা দিতে হবে না *(নায়লুল আওত্বার ৬/২৬১)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১৩৭)ঃ ঈদের খুৎবা চলা কালে টাকা-পয়সা আদায় করা যাবে কি? ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ গোলাম কিবরিয়া
কৈবর্ত গ্রাম, গোয়ালা
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ ঈদের ছালাত আদায় করতে গিয়ে টাকা-পয়সা ছাদাক্বাহ করা সুন্নাত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৯ 'ঈদ' অনুচ্ছেদ)*। আর তা খুৎবা সমাপ্তির পরে করাই উত্তম। নবী করীম *(ছাঃ)* বেলালের মাধ্যমে মহিলাদের দান গ্রহণ করেছিলেন খুৎবা দেওয়ার পর *(বুখারী হা/৯৭৮; মুসলিম হা/১১৪১ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

তবে খুৎবা শোনার আদবের দিকে পূর্ণ খেয়াল রেখে ও শৃংখলা বজায় রেখে খুৎবা চলাকালীন সময়েও টাকা-পয়সা আদায় করা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৩৩/১৩৮)ঃ কুরবানীর দিনে কুরবানীর গোশত খাওয়া পর্যন্ত অনেকেই না খেয়ে থাকেন। এটা কি শরী'আত সম্মত? ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মাঈনুল ইসলাম
আলাদীপুর মাদরাসা
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ কুরবানী দাতার জন্য কুরবানীর দিন গোশত খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত না খেয়ে থাকা সুন্নাত। বুরায়দা *(রাঃ)* বলেন, রাসূলুল্লাহ *(ছাঃ)* ঈদুল ফিৎর-এর দিন না খেয়ে *(ঈদগাহে)* বের হ'তেন না। আর ঈদুল আযহার দিন ছালাত শেষ না করে খেতেন না *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৪৪০)*।

মুসনাদে আহমাদ-এর বর্ণনায় এসেছে যে, فَيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ 'তিনি স্বীয় কুরবানীর গোশত হ'তে খেতেন' *(নায়লুল আওত্বার ৪/২৪১)*। বায়হাক্বীর এক বর্ণনায় এসেছে أَكَلَ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ 'প্রথমে তিনি কলিজা হ'তে খেতেন' *(মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৪৫ পৃঃ, 'দু'ঈদের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। তবে শারীরিক অসুবিধা থাকলে ঈদগাহ থেকে ফিরে এসে যেকোন সাধারণ খাদ্য খাওয়া যাবে। উল্লেখ্য যে, যারা কুরবানী করবেন না তাদের জন্য খাওয়ায় কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৩৯)ঃ আরাফার দিন বা ৯ই যিলহাজ্জ ছিয়াম রাখার ফযীলত কি? ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- আবুল কালাম
জুমারবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ যারা আরাফার ময়দানের বাইরে থাকেন অর্থাৎ যারা হাজী নন তারা আরাফার দিন ছিয়াম পালন করলে তাদের বিগত ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায় *(ছহীহ মুসলিম, তাহক্বীক মিশকাত হা/২০৪৪ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৪০)ঃ মুকুল অবস্থায় কিংবা মুকুল আসার পূর্বে অথবা ৪/৫ বছর একসঙ্গে আম বাগান বিক্রি করা কি শরী'আত সম্মত? ছহীহ দলীলের আলোকে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম
কর্মকার পাড়া
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ মুকুল অবস্থায় কিংবা মুকুল আসার পূর্বে অথবা ৪/৫ বছর এক সঙ্গে ফলের বাগান বিক্রয় করা শরী'আতে একেবারেই নিষিদ্ধ। জাবির *(রাঃ)* বলেন, রাসূলুল্লাহ *(ছাঃ)* ২/৩ কিংবা ততোধিক বছরের জন্য ফলের গাছ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৩৬; মুসলিম নববী সহ ২/১০ পৃঃ; তিরমিযী তুহফা সহ হা/১৩২৭, ৪/৪১৫ পৃঃ)*। অন্যত্র নবী করীম *(ছাঃ)* ফল পাকার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৩৯)*।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আলহাজ্জ ডাঃ মুন্সী হাসরাতুল্লাহ ওয়াকফ এস্টেট (ইসি নং-১৭৮২৩) -এর মাদরাসা 'দারুস সালাম সালাফিয়া', নয়াবাড়ী ভায়া লক্ষ্মীপুর, ডাক- বাঁকড়া, চারঘাট, রাজশাহীতে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি চলিতেছে এবং ২০/০১/২০০২ ইং তারিখ হইতে সকল শ্রেণীর ক্লাস শুরু করা হইবে ইনশাআল্লাহ।

-মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান
মুতাওয়াল্লী